গণতন্ত্র

কিশোর ভারত গ্রন্থমালা

গণতন্ত্র

আশিটি প্রশ্ন ও উত্তর

ডেভিড বীথাম ও কেভিন বয়েল

নিখিল চক্রবর্তীর ভূমিকা

আর. কে. লক্ষ্মণের কার্টুন

অনুবাদ

আশিস ঘোষ

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ইউনেসকো পাবলিশিং-এর সহযোগিতায়

ISBN 81-237-1956-6

1997 (শক 1919)

মূল্য : **32.00** টাকা
Democracy *(Bangla)*
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

এই গ্রন্থ রচনার কর্মসূচিটি প্রণয়ন করেছে ইউনেসকো, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষা প্রসারের অঙ্গ হিসেবে। একইসঙ্গে নানা ভাষায় বইটি অনূদিত হচ্ছে।

এই গ্রন্থে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, এবং বইয়ের সমগ্র অংশ জুড়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, বা যেসব মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলোর কোনটাই কোন দেশের, এলাকার, শহরের বা সে সবের সীমান্ত বা সীমানার বিষয়ে তাদের আইনসঙ্গত মর্যাদার প্রশ্নে ইউনেসকোর বক্তব্য বলে গণ্য হবে না।

এই গ্রন্থের লেখকরাই এই গ্রন্থের বিষয় চয়নে এবং সে সবের প্রকাশভঙ্গীর জন্য দায়ী। সেগুলো ইউনেসকোর বক্তব্য নয়। ইউনেসকো তার জন্য দায়বদ্ধও নয়।
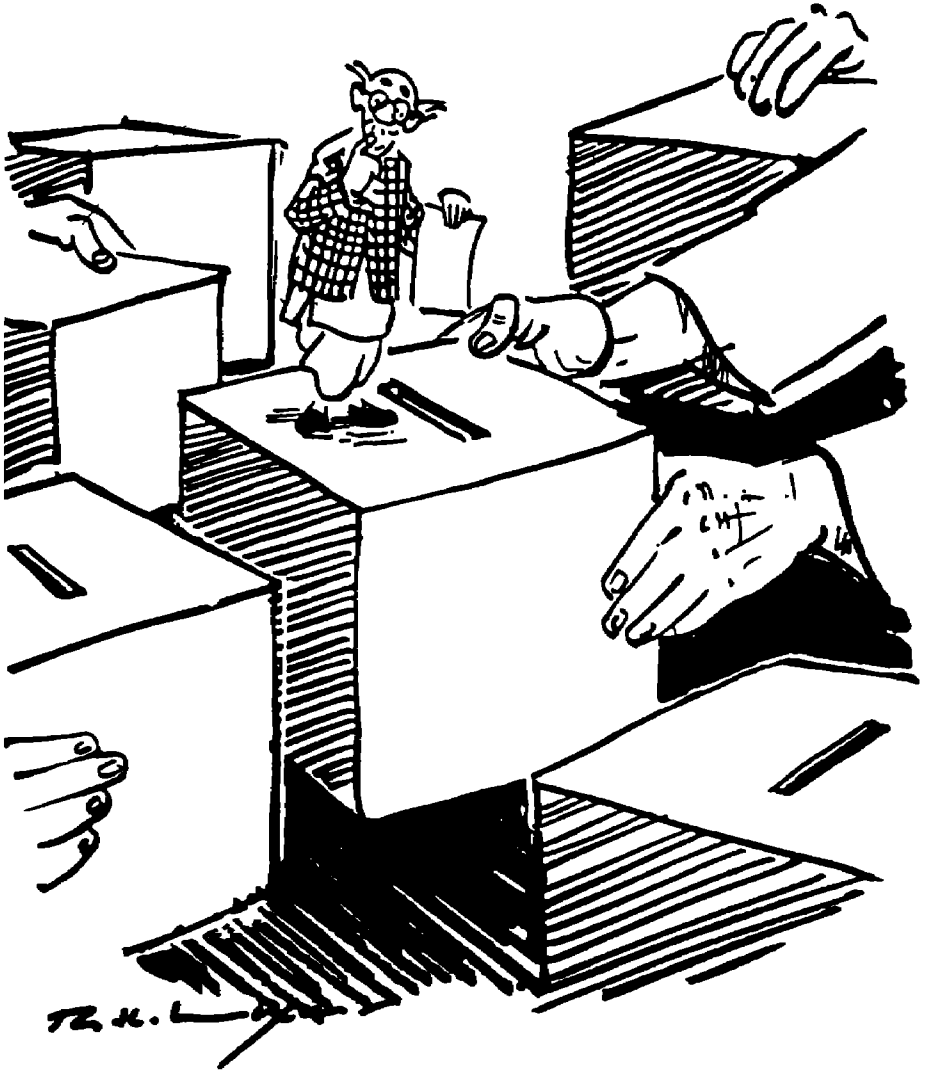
গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষই নির্ধারণ করে তার প্রভু কে হবে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

অনুচ্ছেদ 21

1. প্রত্যক্ষভাবে বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজের দেশের শাসনকার্যে ভাগ নেওয়ার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে।
2. নিজের দেশের সরকারি পদে যোগ দেওয়ার সমান সুযোগ প্রত্যেকের থাকবে।
3. সরকারের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার ভিত্তি হবে জনগণের ইচ্ছা। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বৈধ নির্বাচনে জনসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে। সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ওই নির্বাচন হবে গোপন ভোটে বা তুলনীয় কোন অবাধ ভোটদান প্রক্রিয়ায়।

উক্ত ঘোষণাপত্রে 'মানুষ' বলতে 'পুরুষ' ও 'নারী' উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক উপায়ে নাগরিক সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়। এমন কি আমাদের দেশের প্রাচীন প্রজাতন্ত্রগুলি বা ইউরোপের এথেনীয় গণতন্ত্র সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র প্রমাণ করে যে মানব সমাজে কোন না কোন ভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল এবং তার ইতিহাস খুঁজতে আমাদের ফিরে যেতে হবে দু'হাজার বছরেরও আগে।

মানুষের কর্মক্ষেত্র যত বিস্তৃত হতে পেরেছে বা তার গভীরতা যত সর্বমুখী হয়েছে, ততই তার দূরদর্শিতা প্রখর হয়েছে এবং সুষ্ঠু নাগরিক সমাজ নির্মাণের উদ্দীপনায় মানুষ গণতন্ত্রের শরণাপন্ন হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ একমাত্র এখানেই নীতি নির্ধারণ এমন কি সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারে। অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন মাত্রায় গণতন্ত্র এই সুযোগ কায়েম করার চেষ্টা করে এসেছে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে গণতন্ত্র প্রচণ্ড প্রেরণা লাভ করেছিল সাধারণ মানুষের সক্রিয় যোগদানের ফলে। সে ইতিহাস মুষ্টিমেয় সশস্ত্র দলের মধ্যে সীমিত নয়। সে ইতিহাস অসংখ্য মানুষের। বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্য এই সংগ্রাম আমাদের ঐতিহাসিক পশ্চাদপট, এবং এই পটভূমিতেই আমরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের উদ্বোধন করে। এ এক পরম সিদ্ধি যা লাভ করতে অন্য অনেক দেশের এমন কি উন্নত দেশেরও বহু দশক এবং বহু শতাব্দী লেগেছে।

আমাদের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অনেক কিছু শেখার আছে। প্রশ্ন করা যায়—গণতন্ত্রে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের কথা বলা হয় তা কি কেবল ভোটাধিকারের সাহায্যে নিশ্চিত করা সম্ভব? আমাদের সংবিধান অনুযায়ী যে নির্বাচন প্রণালী প্রচলিত তাতে নির্বাচন কেন্দ্রে যে ব্যক্তি সর্বাধিক ভোট পায় তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তার মানে এই নয় যে সর্বাধিক ভোটের অধিকারী মাত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের সমর্থন পাবে।

এই রকম অনেক দুর্বলতা আমাদের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পদ্ধতিতে লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সারা দেশে চিন্তা ভাবনা চলছে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার যে

সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তার মূলে রয়েছে গণতান্ত্রিক প্রণালী সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। নির্বাচনী ব্যয় সেই রকমই একটি উদ্বেগের বিষয় কারণ এর ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষ এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষার ফলাফল মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছেন। কারণ, মানুষই গণতন্ত্রের চালক। এছাড়া যে যে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতিনিধিত্ব খারিজ করার অধিকার। গণতান্ত্রিক সংবিধানকে সুরক্ষিত করতে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিচারালয়।

নাগরিক সমাজের ক্রিয়াকাণ্ডের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। গণতন্ত্রের অগ্রগতিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন এক যুগান্তকারী ঘটনা। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এটাই হল এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আমাদের গণতন্ত্রকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাই শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। এর সাহায্যে এই বিশাল দেশের ছড়িয়ে থাকা প্রত্যন্ত গ্রামগুলিও সমাজ পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে পারছে।

পাঁচ দশক ধরে গণতন্ত্রের মূল্যবান পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে আমরা কিছু কিছু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এই সঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকলেই নাগরিক সমাজে প্রকৃত গণতন্ত্র বিরাজ করবে তা কিন্তু নয়। সামাজিক ও আর্থিক অসাম্য গণতন্ত্রকে হাস্যকর করে তুলতে পারে। এমন কি বিত্তশালী দেশের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে উপযুক্ত সামাজিক ও আর্থিক সাম্য ছাড়া সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব নয়। একদিকে গগনচুম্বী সমৃদ্ধি আর অন্যদিকে বস্তিবাসীর বঞ্চনা—এ দু'য়ের সহাবস্থানে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ এক গভীর উদ্বেগের বিষয় কারণ বেশির ভাগ মানুষই এখানে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর প্রগতি আজ মানুষকে মহাকাশে পৌঁছে দিয়েছে। তারা পরীক্ষায় মেতেছে জিন বা বংশগতি নিয়ে। অথচ সেই একই সময়ে বিশ্বের বেশিরভাগ অধিবাসীই দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কবলে। এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস! এই অসাম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্রের দাবি কোন নাগরিক সমাজই করতে পারে না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে সহজ ভাষায় তুলে ধরতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এই বইটি তারই ফসল। গণতন্ত্রের বিষয়ে জিজ্ঞাসু প্রত্যেকের মনে যে সব প্রশ্ন অনেক সময় দেখা দেয় তার উত্তর খুঁজতে এই বইটি সাহায্য করবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে যাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ তাঁদের কাছেও এই বইটি সারগ্রন্থ হিসাবে উপলব্ধ হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

নিখিল চক্রবর্তী

মুখবন্ধ

প্রায়শই লোকজনদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শোনা যায়, যদিও এর অর্থ এক এক জনের কাছে এক এক রকম। এই জন্যই গণতন্ত্রেব প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে এত বিভ্রান্তি। গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়?—ব্যক্তি স্বাধীনতা, বহুদল প্রথা, সংখ্যাগুরুর শাসন, সংখ্যালঘুর অধিকাব না আরও কিছু? কোনও দেশ গণতান্ত্রিক কি না বা সেখানে গণতান্ত্রিক উন্নতি কতটা হয়েছে এ সব বিচারেব কোন সর্বজন-গ্রাহ্য মাপকাঠি আছে কি? কোন দেশকে গণতন্ত্রের মর্যাদা পেতে হলে নির্দিষ্ট কিছু সংজ্ঞা বা কার্যসূচী মানতে হবে, নাকি বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন অবয়বে গণতন্ত্র বাস্তবায়িত করা সম্ভব?

এই ধরণেব কিছু প্রশ্নের উত্তব এই বইতে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু উত্তর তুলনামূলকভাবে বেশি নির্দিষ্ট। দেখা যাবে, যে-দেশে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন বা সর্বজনীন মতপ্রকাশের অধিকাব নেই বা যেখানে অ-নির্বাচিত সরকারি কর্মচারীদের উপর নির্বাচিত প্রতিনিধিদেব কার্যকব নিয়ন্ত্রণ নেই, যেখানে সভা-সমিতির অধিকার বা স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার সর্বেব মর্যাদা পায না, সেই দেশকে গণতান্ত্রিক মনে করাব কোন কারণ নেই। কিছু ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাহায্যে বিচার করা যেতে পারে—যেমন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বা নির্বাচন প্রণালীর বৈধতা রক্ষার ব্যাপারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে বিভিন্ন দেশের কার্যপ্রণালী যাচাই করে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংগঠনগুলি (এন.জি.ও.) সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সর্বসম্মত মানদণ্ড গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। আবার অন্য অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে কার্যপদ্ধতির ভিন্নতাও দেখতে পাওয়া যায় এবং তার কোনটা যে পক্ষান্তরে বেশি গণতান্ত্রিক তা নয়। উদাহরণ স্বরূপ : নির্বাচন পদ্ধতি, সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি না প্রধানমন্ত্রী, সেখানকার বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি। গণতন্ত্রের স্বরূপ বুঝতে হলে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতির বিভিন্নতা যেমন বুঝতে হবে তেমনি বুঝতে হবে তার অপরিহার্য দিকগুলি।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরবর্তী পর্যায়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে গণতন্ত্রকে এক বিশ্বব্যাপী আদর্শ হিসাবে দেখা হচ্ছে। বইয়ের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা তাই অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই বইয়ের প্রথম লক্ষ্য নতুন ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির প্রতিটি মানুষ—সেখানকার নাগরিক, নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রশাসক। গণতন্ত্র সম্পর্কে কঠিন প্রশ্নের সরাসরি

উত্তর তাঁরা এই বইতে পাবেন। দ্বিতীয় লক্ষ্য উন্নত গণতন্ত্রের বহু নাগরিক যাঁরা নিজের দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভাল করে জানেন না। গণতন্ত্রকে বাঁচাতে এবং তাতে গভীরতা আনতে প্রয়োজন ওয়াকিবহাল নাগরিকের। আশা করি, এই গ্রন্থ গণতান্ত্রিক শিক্ষায় মানুষকে সচেতন করতে সাহায্য করবে।

আজকের গণতন্ত্র সমস্যামুক্ত, এই ভান করার কোন অর্থ হয় না। গণতন্ত্র আজ বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। জাতি, ধর্ম ও অন্যান্য বিভেদাত্মক তত্ত্ব; বেকার সমস্যা এবং অর্থনীতিতে অবনতি বা আকস্মিক পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা প্রক্রিয়ার সামনে শক্তিহীনতা ও নিজের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবার আশঙ্কায় মানুষ নিষ্পেষিত। এগুলির সমাধান করতে আমরা অপারগ, কিন্তু বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রকে রক্ষার প্রয়োজনে বিষয়গুলির অবতারণা অত্যন্ত জরুরী বলে আমরা মনে করি।

প্রথম ও শেষ প্রশ্ন একটাই—গণতন্ত্র আমাদের কাছে মূল্যবান কেন? এই প্রশ্নের উত্তর বইয়ের পাতা থেকে এখন খুঁজে নিতে হবে পাঠককেই। বইটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য আমাদের লিখে পাঠালে (পলিটি প্রেসের ঠিকানায়) আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব। আশা করি বইটি আপনাদের কাজে লাগবে।

ডেভিড বিথম
কেভিন বয়েল

1

মৌলিক ধারণা এবং নীতি

1. গণতন্ত্র কি?

জীবনের সব ক্ষেত্রে আমবা কোন কোন গোষ্ঠী বা সংঘের সাথে—তা সে পরিবার, পাড়া, ক্লাব, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্র বা রাজ্য যাই হোক না কেন, ছোট থেকে বড়, এই সব সংঘ সামগ্রিক স্বার্থে কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য যেমন, সমগ্রের লক্ষ্য কি হবে, কি কি নিয়ম মানতে হবে, দাযিত্ব কি ভাবে ভাগ করা হবে বা সদস্যরা কি কি সুবিধা পাবে বা না পাবে। একে বলা যায় *সামগ্রিক* সিদ্ধান্ত। এর সঙ্গে *ব্যক্তিগত* সিদ্ধান্তের তফাত করতে হবে, কাবণ তা লোকে নেয় সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে। গণতন্ত্র সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যাযে পড়ে। এর অন্তর্নিহিত আদর্শ এই যে সমগ্রের খাতিরে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা যেন সব সদস্য মিলে নেয়, এবং তাদের প্রত্যেকের যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে ভাগ নেওয়ার সমান অধিকার থাকে। গণতন্ত্রে তাই দুটি তত্ত্ব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে *জনগণের নিয়ন্ত্রণ* এবং সেই নিয়ন্ত্রণে সবার *সমান অধিকার*। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে যখন এই দুটি তত্ত্ব বহাল থাকে তখম তাকে আমরা গণতান্ত্রিক বলি।

গণতন্ত্র—সমাজে এবং রাষ্ট্রে

গণতন্ত্রকে এই ভাবে পৃথক করলে দুটি জিনিস প্রথমেই পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমত গণতন্ত্র শুধু রাষ্ট্র বা সরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত নয়, যদিও সে ভাবে ভাবাটাই আমাদের অভ্যাস। গণতান্ত্রিক নীতি যে কোন সংঘের যে কোন সামগ্রিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত। কার্যত রাষ্ট্রের গণতন্ত্র আর সমাজ সংগঠনের গণতন্ত্রের মধ্যে এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে। যেহেতু প্রায় সব সংঘ রাষ্ট্রের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে এবং সমগ্র সমাজের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে—যেমন আবশ্যিক কর আদায় বা নাগরিকদের জীবন মরণের উপর নিয়ন্ত্রণ—তাই রাষ্ট্রীয় স্তরে গণতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই গণতান্ত্রিক সরকারের আলোচনাই হবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এক আনুপাতিক তত্ত্ব

দ্বিতীয়ত আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতন্ত্রের মানে এমন নয় যে হয় তা পুরোপুরি পাওয়া গেল নয় একেবারেই পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা আনুপাতিক। মানে সিদ্ধান্ত হিসাবে সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বা রাজনৈতিক সাম্যের আদর্শ কতটা বাস্তবায়িত হল সেটাই বিচার্য। সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমগ্রের যোগদানের আদর্শ কতটা কার্যকর করা গেল সেটাই লক্ষ্য। প্রথা অনুযায়ী আমরা সেই রাষ্ট্রকেই গণতান্ত্রিক বলি যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, যেখানে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোট দেওয়াব আব নির্বাচনে দাঁড়াবার সমান অধিকারে অধিকারী এবং যেখানে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার আইনের সাহায্যে সুরক্ষিত। তবুও এমন কোন রাষ্ট্র নেই যেখানে গণনিয়ন্ত্রণ ও রাজনীতিক সাম্যের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করতে পারা গেছে। সেই হিসাবে গণতন্ত্র এমন এক প্রক্রিয়া কখনই শেষ হওয়ার নয়। শাসনকাঠামো যাই হোক না কেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ সব দেশে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করতে নিরন্তর সংগ্রাম কবে চলেছে।

2. গণতন্ত্র আমাদের কাছে মূল্যবান কেন?

আমাদের কাছে গণতন্ত্রের মূল্য যে অনেক, তার অনেক কারণ আছে।

নাগরিক সাম্য

গণতন্ত্রের নীতি হল প্রতিটি মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা। কিছু মানুষের জীবন অন্যাদের তুলনায় বেশি মূল্যবান—এই মতবাদ খণ্ডন করে ব্রিটিশ চিন্তাবিদ জেরিমি বেন্থাম লিখেছিলেন, 'এভ্রিওয়ান টু কাউন্ট ফর ওয়ান অ্যাণ্ড নান ফর মোর দ্যান ওয়ান'—অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ একজন হিসাবেই গুরুত্ব পাবে, একের বেশি গুরুত্ব কাউকে দেওয়া উচিত নয়। সরকারি নীতি সব মানুষের স্বার্থের প্রতি সমান নজর দেবে—সাম্যের নীতি কেবল এটুকুই বলে না। সব মানুষের মতামতকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলে। ইউরিপিডিস-এর এক নাটকে জনৈক এথেন্সবাসী বলেন, 'ধনসম্পদকে আমরা বিশেষ ক্ষমতা দিই না। গরীব মানুষের মতামতও সমান গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।' তবে গণতন্ত্রের সমালোচকরা সবসময়েই বলে এসেছেন, সরকারি নীতি নির্ধারণের কাজে অংশ নেওয়ার পক্ষে জনগণ খুবই অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং অদূরদর্শী। এর জবাবে গণতন্ত্রবাদীরা বলেন, তথ্য হাতে পৌঁছে দেওয়া এবং তা বোঝার মতো সময় মানুষকে অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষও প্রয়োজনে পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পারেন।

মানুষের চাহিদা পূরণ

অন্য যে কোন সরকারের তুলনায় গণতান্ত্রিক সরকাব সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে বেশি সক্ষম। নীতি নির্ধারণে জনসাধারণের মতামত যতবেশি গ্রাহ্য হবে, ততই তাতে মানুষের আশা ও আকাঙ্খা প্রতিফলিত হবে। প্রাচীন এথেন্সবাসীরা বলত, 'মুচি জুতো বানায় বটে, তবে যে পবে সেই জানে ফোস্কাটা কোথায়!' সরকারি নীতির ফলভোগ করতে হয় সাধারণ মানুষকে। সরকারি নীতি তখনই মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে যখন নীচের থেকে ক্রমাগত চাপ আসতে থাকে। যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, শাসক সম্প্রদায় যদি জনসাধারণের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয় তাহলে মানুষের প্রয়োজন তারা মেটাতে অক্ষম। শুধু তাই নয়, তারা স্বার্থান্বেষী ও ভ্রষ্টাচারী হয়ে পড়ে।

বহুত্ব ও আপস মীমাংসা

খোলাখুলি বিতর্ক, মীমাংসা ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। গণতন্ত্রে বিতর্কের উপর জোর দেওয়া হয়—শুধু মত ও স্বার্থের পার্থক্য বোঝাতে নয়, বরং এই জন্যে যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করার ও শোনার অধিকার প্রত্যেকের আছে। গণতন্ত্র তাই একই সঙ্গে সমাজের ভিন্নতা বা বহুত্ব মেনে নেয়, আবার স্বীকার করে নাগরিক সাম্য। ভিন্ন মত দেখা দিলে তা আলোচনা কবে এবং আপসে মীমাংসা করে মতপার্থক্য দূব করতে হয়—জোর করে বা শক্তি প্রয়োগ করে নয়। গণতন্ত্রকে অনেকে 'মেছো বাজার' বলেন। তা বলে জনতার সমস্যা নিয়ে গণ-বিতর্ক দোষের নয় বরং গুণের। কারণ জনমতের আনুকূল্যে নীতি গড়ে উঠলে তা সকলে মেনে নেয় এবং কাজে বাধা পড়ে না।

মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা

গণতন্ত্রে বুনিয়াদি বা মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকে। মত পার্থক্য মেটাতে খোলাখুলি আলোচনা তখনই সম্ভব যখন নাগরিক ও রাজনীতিক চুক্তিবদ্ধ হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, চলা ফেরার বা সুরক্ষার স্বাধীনতা —এগুলির প্রয়োজন গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এই বুনিয়াদি অধিকার ব্যক্তির নিজের উন্নতির জন্য এবং সমবেত নীতিনির্ধারণের জন্য প্রয়োজন—এর সপক্ষে অনেক যুক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে।

সামাজিক পুনরুজ্জীবন

গণতন্ত্র সামাজিক পুনরুজ্জীবনে বা নবীকরণে সাহায্য করে। অসফল বা অপ্রয়োজনীয় নীতি ও রাজনীতিকদের সরিয়ে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মিত প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র সমাজ

পুনরুজ্জীবনের রাস্তা প্রশস্ত করে দেয়। অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন আসে অরাজকতার মধ্যে দিয়ে বা শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে।

3. গণতন্ত্রের ধারণা এল কোথা থেকে?

জনজীবন সাধারণ মানুষের ইচ্ছার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। এই ধারণা বিভিন্ন দেশ কালে দেখা গেছে। খ্রিস্ট-পূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে এর এক ধ্রুপদী রূপ দেখা যায় এথেন্সে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শুরুতে সরকারি পদের জন্য সম্পত্তির যোগ্যতা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি এথেনীয় সমান অধিকারে আইন সভার আলোচনায় ভাগ নিতে ও ভোট দিতে পারত এবং সমাজের নীতি ও আইন প্রণয়নে ভাগ নিতে পারত। এমন কি পর্যায়ক্রমে জুরি হিসাবে প্রশাসনে সাহায্য করতে ও প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য হতে পারত। সেইথেকে এই প্রথম গণতন্ত্রের উদাহরণ সবদেশের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। আবার এই একই সময়ে এথেন্সের আর্থিক সমৃদ্ধি নৌ-যুদ্ধে শ্রেষ্ঠতা ও শিল্প-সংস্কৃতি-দর্শনে সৃজনশীলতা দেখা দিয়েছিল। কাজেই গণতন্ত্র বিরোধীরা যে বলেন, সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে চললে সমাজ বৈচিত্র্যহীনতা বা দায়িত্বহীনতার শিকার হয় তা সর্বৈব মিথ্যা।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

আজকের গণতন্ত্রের তুলনায় এথেনীয় গণতন্ত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি আবার কিছু ক্ষেত্রে কম গণতান্ত্রিক ছিল। বেশি বলা হচ্ছে এই কারণে যে প্রাচীন এথেন্সের নাগরিকেরা মৌলিক নীতি নির্ধারণে সরাসরি ভাগ নিত (প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র)। আজকের গণতন্ত্রে নাগরিকেরা সেই কাজ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে করে। কাজেই আজকের গণতন্ত্রে সরকার বা সংসদের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে সাধারণ মানুষ দূরে থাকে। অগণিত নাগরিক এক জায়গায় জড়ো হতে না পারলে অথবা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও বোঝার সময় দিতে না পারলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কখনই সফল হতে পারে না। এ দুটির কোনটিই আজ সম্ভব নয়। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা বা গণভোটের প্রসার ঘটিয়ে, জনগণকে স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে ভাগ নেওয়ার সুযোগ দিয়ে গণতন্ত্রকে মজবুত করে তোলার অনেক উপায় আছে।

সীমিত নাগরিকত্ব

আজকের তুলনায় এথেনীয় গণতন্ত্র কম গণতান্ত্রিক ছিল এই কারণে যে সেখানকার নাগরিকত্বের অধিকার ছিল শুধুমাত্র স্বাধীন পুরুষদের। মহিলা, ক্রীতদাস ও বিদেশিরা সেই অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। তাদের শুধু উৎপাদনের কাজে লাগানো হত যাতে পুরুষ নাগরিকরা রাজনীতির চর্চায় সময় কাটাতে পারে। নাগরিকত্ব সীমিত হওয়ায়

সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব হয়েছিল। 'গণরাজ্য' ছিল বটে তবে সেখানকার জনগণ শাসন করত বিশেষাধিকারের ভিত্তিতে।

সীমিত নাগরিকত্ব—আধুনিককালে

বিংশ শতকে পৌঁছেও পশ্চিমী সংসদীয় প্রথায় নাগরিকত্বের উপরে নানা বিধিনিষেধ ছিল। 'রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস মানুষ'—ফরাসি বিপ্লবের এই আদর্শে মানুষ বলতে সব মানুষকে বোঝাযনি। পশ্চিমের বেশিরভাগ দেশে নারী ও সম্পত্তিহীনেরা ভোটাধিকার পেয়েছেন সবেমাত্র বর্তমান শতকে। এমনকি আজও কোন কোন দেশে সব প্রাপ্তবযস্কেব মতদানেব অধিকাব নেই তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান যাই হোক না কেন।

4. প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা কি সত্যিই গণতান্ত্রিক হতে পারে?

আঠেরো শতকের বাজনৈতিক চিন্তাবিদ রুশো মনে করতেন, প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নয। তাঁব মতে, এই ব্যবস্থায় মানুষ কিছু সময়ের জন্য স্বাধীন থাকে। এই স্বাধীনতা কেবল নির্বাচনেব সময পাওযা যায। তার পবেই দুটি নির্বাচনের মাঝখানেব সময়ে মানুষ পুবোপুরি শাসকদেব অধীন হয়ে পড়ে, তার দশা হয় ক্রীতদাসের মতোই। প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার বামপন্থী সমালোচনার এটা চরম নিদর্শন। এর বিপরীতে দক্ষিণ পন্থীদেব মত হল, প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থায় মানুষকে বড় বেশি বলার সুযোগ দেওয়া হয়।

নির্বাচনেব মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ

বর্তমানে যেখানে নাগবিকেব সংখ্যা লক্ষ কোটি এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলানোর সময় সাধারণ মানুষেব নেই সেখানে সরকারের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ উপায অবশ্যই প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা। জনসাধারণ সবকারকে নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের প্রধান (প্রধানমন্ত্রী অথবা বাষ্ট্রপতি) এবং আইনসভা বা সংসদের সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে। এই নির্বাচিত আইনসভা আবার জনগণের হয়ে সরকাবেব কাজকর্মের উপর সতর্ক নজব বাখে। আইন বা করনীতি সংসদেব অনুমোদন সাপেক্ষ। প্রয়োজনে সংসদ কোন আইন খারিজও করতে পারে। তবে নির্বাচন যদি 'বৈধ ও অবাধ' হয়, সরকার যদি প্রকাশ্যভাবে কাজ করে এবং কার্যক্ষেত্রে সরকারি কাজকর্ম তদারকি করার যথেষ্ট ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকে তা হলেই জনতার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

জনমত

প্রতিনিধিত্ব প্রথায় যদিও নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমেই জনসাধারণ সরকারের নীতি

নির্ধারণ করে তবুও সেটাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। মানুষ সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে আইন প্রণয়নের পক্ষে বা বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারে, রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারে বা সরাসরি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারে। অন্যদিকে, ভুক্তভোগীদের বা তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু লোকের সঙ্গে সরকার আলোচনায় বসতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, খুব কম প্রতিনিধি-ভিত্তিক সরকার আছে যাদের উপর প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন বা জনমতের প্রভাব পড়ে না। তবুও, জনমত প্রকাশের এই সব রাস্তা খোলা থাকতে পারে যদি সুপরিচালিত নির্বাচন ব্যবস্থা বজায় থাকে। সরকার তখনই লোকের কথা শোনে যখন তারা জানে যে কথা না শুনলে তাদের গদি থেকে তাড়ানো হবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ

কাজেই প্রতিনিধি প্রথায় জনতার নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব যখন লোকে সরকারের নীতি নির্ধারনে বা প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে ভাগ নেয়, এবং যখন বিধানসভা ও সংসদে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে সরকারের কাজকর্মের তদারক করে বা বিভিন্ন উপায়ে জনমতের প্রসার ঘটিয়ে সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

রাজনৈতিক সাম্য

এবারে আসা যাক গণতন্ত্রের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত (প্রশ্ন 1) অর্থাৎ রাজনৈতিক সাম্যের প্রশ্নে। একভাবে দেখতে গেলে প্রতিনিধি প্রথা এক অসমতার উপর দাঁড়িয়ে—অল্প কিছু লোক সবার হয়ে রাজনৈতিক সঙ্কল্প নিয়ে ফেলে। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সাম্য বহুলাংশে অর্জন করা সম্ভব কারণ প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার আছে সরকারি সংস্থায় কাজ করার জনস্বার্থে আন্দোলন করার এবং অপ-শাসনের বিরুদ্ধে বিচার চাইবার। এ ছাড়া নির্বাচনে সমান ভোটদানের অধিকার তো আছেই। কার্যত, এই মানদণ্ড অধিকাংশ গণতন্ত্র পুরো করতে পারে না। কারণ জনসমাজে সময় সামর্থ, অর্থ ও সুযোগের পার্থক্য। বস্তুত প্রতিনিধি প্রথায় গণতন্ত্রের একটা প্রধান কাজ হল সরকারের উপর গণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন রাস্তা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত প্রভেদ কমিয়ে রাজনৈতিক প্রভাবের রাস্তা প্রশস্ত করা।

5. গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কি ?

বিশাল মানব সমাজে ব্যক্তিগত স্তরে নাগরিকের প্রভাব যতখানি তার থেকে অনেক বেশি হয় সংঘবদ্ধ হলে। রাজনৈতিক দল সম-মতের মানুষকে একত্রে এনে তাদের স্বার্থে আন্দোলন করে ও সরকার গড়ার চেষ্টা করে। তারা অনেক ধরণের কাজ করে। দলের মূলনীতি ও কর্মসূচী তৈরি করে *ভোটদাতাদের* তুলনামূলক বাছাইয়ের সুযোগ

করে দেয়। নির্বাচনে জিতলে সমর্থকদের ভরসায় সরকারের সাহায্যে কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে পারে। আর যারা *দায়িত্বশীল রাজনীতিক* তাদের জনসেবার সুযোগ দেয়।

যথার্থ প্রতিযোগিতা

মুক্ত ও বৈধ নির্বাচনী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের সাফল্য নির্ভর করে ভোটদাতাদের সমর্থন পাওয়া ও টিকিয়ে রাখার উপর। কাজেই কর্মসূচি তৈরি ও প্রতিনিধি বাছাইয়ের পর্যায়ে জনমতের কথা সবসময় খেয়াল রাখা উচিত। তা না হলে একটি দলকে হারতে হতে পারে এবং সেই জায়গায় অন্য একটি দল এসে যেতে পারে। জনতার আশা-আকাঙ্খা সরকারি স্তরে কার্যকর করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল রাজনৈতিক দল। তবে এই ভূমিকা রাজনৈতিক দলগুলি ততক্ষণই পালন করতে পারে যতক্ষণ নির্বাচনী প্রতিযোগিতা হয় 'খোলা ময়দানে'। অর্থাৎ যদি সরকারি সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানোর উপায় বা ভোটারদের প্রভাবিত করার সামর্থ্য এক দলের তুলনায় অন্য দলের বেশি আয়ত্তে থাকে তা হলে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ন্যায্য হতে পারে না। তাই সরকারি কাজ ও সংগঠন এবং দলীয় কাজ ও সংগঠনের মধ্যে ভেদরেখা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

সামাজিক বিভাজন

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রকাশ্য নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য তেমনই এটাই তার দুর্বলতম স্থান। সরকারি পদ দখলের প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করে, এই প্রতিযোগিতায় যারা লড়ে তাদের ঝুঁকিও খুব বেশি। তাই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে খেয়াল রাখতে হবে, পরাজিত দলের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এমন না দাঁড়ায় যে পরের নির্বাচনে তারা আর লড়তেই পারল না। কোন দল একবার হারলেও পরের নির্বাচনে যাতে ভাল ফল করতে পারে সেই আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার। দুটি নির্বাচনের মাঝখানে পরাজিত দল যাতে সংগঠন প্রসার ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে পারে, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

6. গণতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমের প্রয়োজন কেন?

যে কোন রাজনৈতিক প্রণালীতে যে কোন সরকার জনসাধারণকে তাদের নীতি সম্বন্ধে অবহিত করার চেষ্টা করে বা তাদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে। যেহেতু সংবাদপত্র, রেডিও বা টি.ভি.-র মতো গণমাধ্যমের সাহায্যেই তা সম্ভব তাই জনসমাজে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা বলে গণতন্ত্রে যে শুধু সরকারি প্রচার চলবে তা নয়। গণমাধ্যম সরকারের কাজকর্ম পর্যালোচনা করবে, মানুষকে খবর

পৌঁছে দেবে, রাজনৈতিক বাদানুবাদের মাধ্যম হবে এবং জনমত গড়ে তুলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

অতন্দ্র প্রহরায় সাংবাদিক

অনুসন্ধান চালিয়ে ও তথ্য সরবরাহ করে প্রচারমাধ্যম প্রতিটি সরকারের স্বাভাবিক গোপন করার প্রবণতা এবং তাদের জন-সংযোগ বিভাগের বিশাল উপস্থিতিকে বানচাল করে। সরকার তখনই মানুষের কাছে দায়বদ্ধ হয়, যখন তার কাজকর্ম লোকের চোখে পড়ে, এবং যখন সরকারের দাবি লোকে স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারে। যদিও প্রচারমাধ্যমের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার হস্তক্ষেপ উচিত নয় তবুও তথ্য সরবরাহ তাদের অবশ্য কর্তব্য, এবং সে তথ্য জানার অধিকার মানুষের আছে। অন্যথায়, প্রহরীর কাজে প্রচারমাধ্যম তার প্রধান যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলবে।

প্রকাশ্য বিতর্ক

তথ্য সরবরাহ ছাড়াও প্রচারমাধ্যমের কাজ প্রকাশ্য বিতর্কের মাধ্যম হওয়া, যাতে মন্ত্রী বা অন্যান্য সরকারি পদাধিকারী জনতার জেরার সম্মুখীন হয়, জনসাধারণ যেন তা জানতে পারে এবং এতে সাধারণ নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। এইভাবেই প্রচার মাধ্যম সরকারের কাছে জনমত পৌঁছে দিতে পারে। এবং এইভাবেই প্রচারমাধ্যম সংসদের সিদ্ধান্ত সমীক্ষার ও বিবেচনার কাজে জনতাকে সহযোগী ও পরিপূরক রূপে হাজির করতে পারে।

প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা

গণতন্ত্রে এই যদি প্রচারমাধ্যমের মুখ্য ভূমিকা হয় তাহলে তাকে স্বাধীন হতে হবে, অর্থাৎ সরকারি বা ক্ষমতাশালী স্বার্থগোষ্ঠীর চাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। সরকারি কর্তৃত্ব কম করা যায় যদি স্বাধীন কমিশন বা জনগোষ্ঠীর দ্বারা সরকারি মাধ্যমকে দায়বদ্ধ করা যায়, এবং বেসরকারি মাধ্যমকে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া যায়। বেসরকারি স্বার্থগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় যদি আইন বা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা একচেটিয়া মালিকানা সীমিত করা হয়। এর মধ্যে কোনটাই অবশ্য নিরপেক্ষতার বা গণতান্ত্রিক কার্যকারিতার নিশ্চয়তা নয়। সাফল্য মূলত নির্ভর করে সাংবাদিক, সম্পাদক ও কর্মীদের স্বাতন্ত্র্য ও পেশাদার নিষ্ঠার উপর এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের অবদানে মানুষ কতটা স্বীকার করে তার উপর।

7. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে উদারনৈতিক গণতন্ত্র কেন বলা হয়?

প্রথম কারণটি ঐতিহাসিক। পশ্চিমের অধিকাংশ রাষ্ট্র গণতন্ত্রী হওয়ার আগে উদারনৈতিক

সরকারের গোপনীয়তার প্রবণতা মোকাবিলায় প্রয়োজন অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা।

ছিল। মানে, ওইসব দেশে প্রথমে উদারনীতিক নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়, পরে সর্বজনীন নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল প্রথা গড়ে ওঠে। উদারনীতিক শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল—নির্বাচিত সংসদের তৈরি আইনের কাছে সরকার বা প্রশাসনের অধীনতা ('আইনের শাসন'); ব্যক্তি-অধিকারের নিশ্চয়তা যাতে প্রত্যেকে আইনের সুরক্ষা ও মতপ্রকাশ এবং সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা পায়; সরকার ও সংসদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বিচার-বিভাগের প্রতিষ্ঠা যাতে আইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যক্তি অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। যে সমস্ত গণতন্ত্রে এই নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি শক্ত শিকড় গাড়ার আগেই ভোটাধিকার প্রসারিত করা হয় ও গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে সেগুলি কখনই তেমন শক্তিশালী হতে পারেনি।

আইনের শাসন

উদার নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতন্ত্র কেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার দ্বিতীয় কারণ এইরকম। আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের হাতে অসীম ক্ষমতা। সবকাব যতই জনপ্রিয় হোক না কেন তার কাজকর্ম যদি আইনের আওতায় না আনা যায়, যদি সংসদেব অনুমতি ছাড়াই সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে, যদি সে নাগরিক স্বাধীনতার তোয়াক্কা না করে তা হলে সরকারের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। গণতন্ত্র মানে এই নয় যে লোকে যে কোন সময় যে কোন দাবি তুলে অবিলম্বে তার নিষ্পত্তি চাইবে। গণতন্ত্র মানে সবকারের উপর ববাবরের নিয়ন্ত্রণ ও তাকে প্রভাবিত করার এক সুস্থ পরিবেশ। এই পরিবেশ গড়ে তুলতে যে উদাব নিয়মতান্ত্রিকতার মূল উপাদানগুলি জরুরি বলে প্রমাণিত তা আগেই বলা হয়েছে যথা আইনের শাসন, প্রশাসন, আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের নিশ্চয়তা।

নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতন্ত্র

'নিয়মতান্ত্রিকতা'র নিহিত অর্থের মধ্যে উপরোক্ত এবং গণতন্ত্রেব অন্যান্য উপাদান ছাড়াও ধরা হয় যে এই উপাদানগুলি রক্ষা করা সম্ভব একমাত্র লিখিত সংবিধানে, যে সংবিধানে নাগরিকদের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের অধিকার ও কর্তব্য স্পষ্ট নির্দেশিত থাকবে এবং মানুষ তা খোলাখুলি জানবে। সংবিধানেব এই বিশেষ মর্যাদা অনুধাবন করেই সবকারি পদাধিকারী দল ও গোষ্ঠীস্বার্থের উপরে উঠে শপথ নেন, এবং সংবিধান পাল্টাতে গেলে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বহুমত বা জনমত যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়। তা সত্ত্বেও লিখিত সংবিধানের সুরক্ষা নির্ভর করে বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত ইচ্ছা ও ক্ষমতা এবং সজাগ মানুষের সচেতনতার উপর।

৪. উদারনৈতিক গণতন্ত্রই কি গণতন্ত্রের একমাত্র রূপ?

বিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গণতন্ত্রের বাইরেও রাষ্ট্রীয় স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একাধিক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ করে একদলীয় ব্যবস্থার অধীনে। কম্যুনিস্ট ব্যবস্থাই এদের মধ্যে সবথেকে বেশি পরিচিত। বিপ্লবের ফলে জনগণের যে সার্বিক উন্নতি তা যাতে কোন ভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয় সেটাই হল এই ব্যবস্থার পক্ষে সব থেকে বড় যুক্তি। এছাড়াও আছে ব্যক্তি মালিকানার প্রভাব খর্ব করা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রবেশ বন্ধ। ক্ষমতাশীল দলের কর্তব্য দ্বিবিধ, সমাজের তলার থেকে আসা জনমতকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং সরকারি নীতির পক্ষে সমাজের উপর তলার জনমতকে সংগঠিত করা।

দায়বদ্ধতার অভাব

আজকের দিনে কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার সমর্থনে কিছু বলাটা আর রেওয়াজ নয়। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে কম্যুনিস্টদের যুক্তিতে গণতন্ত্রের উপর আস্থা ছিল· কিন্তু বাক স্বাধীনতা ও সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা না থাকায় শুধু দল সমর্থিত মতামত ও সভাসমিতিব প্রচারই ছিল সম্ভব। অর্থাৎ সরকারি নীতি বা কর্মচারীদেব কাজের কৈফিয়ত চাইবার যথেষ্ট সুযোগ মানুষের ছিল না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রগতি সত্ত্বেও তাই কম্যুনিস্ট ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছিল—বেআইনি দমননীতি চালিয়ে পুলিশি ব্যবস্থার সাহায্যে টিকে থাকা ছাড়া তার গতান্তর ছিলনা।

একদলীয় শাসন

আফ্রিকায় অসমাজতন্ত্রী একদলীয় গণতন্ত্র গড়ে তোলার প্রয়াসও প্রায় একই রকম চরম পরিণতির শিকার হয়েছে। এখানেও উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। এই ব্যবস্থার সমর্থনে যুক্তি ছিল—আফ্রিকাব বহুজাতিক সমাজ পরম্পরাগতভাবে ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করছে এবং সেখানে 'অনুগত বিরোধিতা'-র কোন নজির নেই। কাজেই বহুদলের মতানৈক্য সামাজিক বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। সমাজ বিভাজন দূর করতে তাই দরকার একদলীয় প্রথা। তাছাড়া দলের মধ্যে মতানৈক্য ও প্রতিযোগিতা চলতে পারে, নির্বাচনের সময় লোকে একাধিক প্রার্থীর মধ্যে থেকে প্রতিনিধি বেছে নিতে পারে এবং অপ্রিয় মন্ত্রীদের পদচ্যুত করার সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ক্ষমতাহীন দলের বাইরে লোক সংঘবদ্ধ হতে না পারায় সরকার ও নেতারা দায়িত্বহীন ও স্বৈরাচারী হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার পৃথকীকরণ না হওয়ায় আইনের শাসনের কোন অর্থ থাকল না সংসদের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রশ্ন করার নাগরিক স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত রইল না।

উদারনীতি ও গণতন্ত্র

ইতিহাস তাই বলে, উদারনীতি ভিন্ন অন্য উপায়ে গণতন্ত্র নির্মাণের চেষ্টা অসফল হতে বাধ্য। সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা বা মুক্ত নির্বাচনী প্রতিযোগিতা যতই অসুবিধাজনক হোক, জনগণের প্রভাব, সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ, আইনের শাসন, ক্ষমতার পৃথকীকরণ ইত্যাদি সরকারকে সংযত রাখার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। অবশ্যই উদার গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় পরিস্থিতি মাথায় রেখে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ আছে। তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে গতানুগতিক ধাঁচায় স্থানীয় স্তরে যেভাবে গণতন্ত্র কাজ করে এসেছে, সেই একই ধাঁচা আধুনিক রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। আধুনিক রাষ্ট্র এক অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন অবয়ব। এই চরম রাষ্ট্র অবয়বের বিরুদ্ধে পশ্চিমের উদারপন্থী ও সংবিধানতান্ত্রীরা যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও দায়বদ্ধ সরকার গঠনের দাবিতে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা বর্তমান গণতন্ত্রীদের কাছেও এক মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়।

9. খোলা বাজার অর্থনীতি কি গণতন্ত্রের পক্ষে জরুরী ?

এ এক জটিল প্রশ্ন। এর কোন সোজা উত্তর নেই। এক অর্থে মুক্ত বিনিময়ের ভিত্তিতে উৎপাদন ও বন্টন গণতন্ত্রের পরিপূরক। গণতন্ত্রে মনে করা হয় বাজার এক নিরপেক্ষ শক্তি যা ব্যক্তিবিশেষকে নিজের স্বার্থ ও বিবেচনা অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়। এই ব্যবস্থায় ক্রেতাই সার্বভৌম ঠিক যেমন গণতন্ত্রে ভোটদাতা। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ক্রেতার সমর্থনের উপর ঠিক যেমন ভোটদাতার সমর্থনের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের সাফল্য। তা ছাড়া খোলাবাজার নাগরিক সমাজে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ করে রাষ্ট্রশক্তির সীমা বেঁধে দেয়। অর্থনৈতিক ভাগ্যনির্ধারণে সহায়তা করে বা স্বাধীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগে আর্থিক অনুদান জুগিয়ে মানুষকে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতে দেয় না। এদিক থেকে খোলা বাজার গণতন্ত্রের সমর্থক বটে।

বাজারের অসুবিধা

অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত বাজার পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত উৎপাদন ও মন্দার কবলে পড়ে, অর্থনীতি বেসামাল হয়ে যায়। দেশের স্বনির্ভরতা নষ্ট হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য দরদামের টানা-পোড়েনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নানা ধরণের অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাবে দেশের মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের পার্থক্য বাড়তে থাকে। গণতান্ত্রিক সাম্যের রাজনৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। চাহিদা ও জোগানের নিয়মে শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হয়, শ্রমিক ছাঁটাই অনিবার্য হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপে শিল্পায়নের প্রথমদিকে গণতন্ত্রকে খোলা বাজারের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করা

বহু-দলীয় প্রথা।
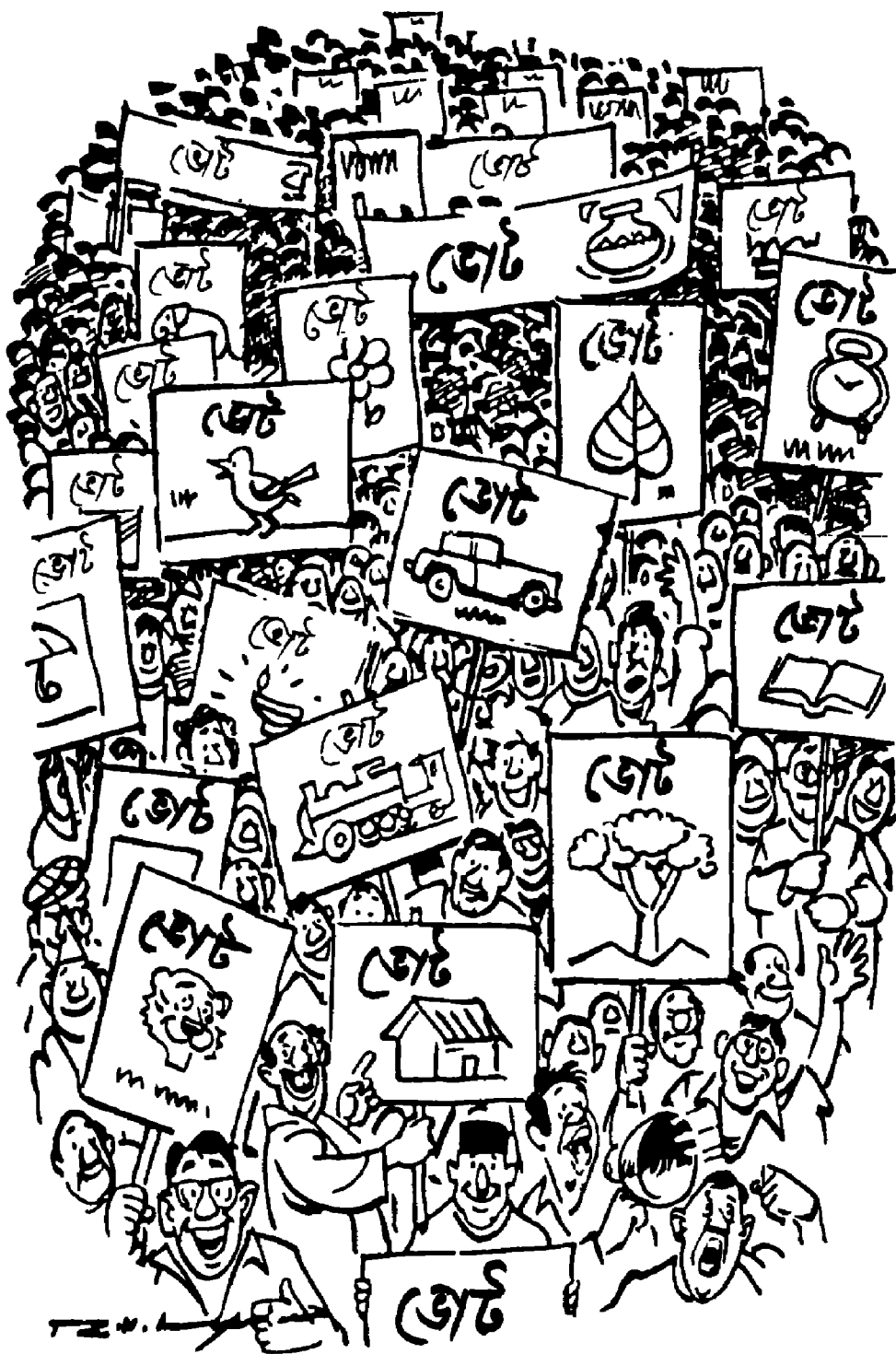
হত। তাই উনিশ শতকে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধিতা করা হয়েছিল। এমন কি মুক্ত অর্থনীতির সমর্থকেরা গণ অসন্তোষ মোকাবিলায় স্বৈরতন্ত্রের দ্বারস্থ হয়েছিল। পশ্চিমী দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেছে। বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ও তাতে হস্তক্ষেপ করেছে। আর্থিক পুনর্বণ্টনে সাহায্য করেছে এবং কল্যাণমূলক কিছু ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্বল মানুষের অধিকারকে বাজারের অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছে।

ধোঁয়াটে সম্পর্ক

অবাধ অর্থনীতির সমর্থকদের গণতন্ত্র ও বাজারের এই ধোঁয়াটে সম্পর্কের কথা মনে রাখা দরকার। আবার সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আমলাদের অবাধ ক্ষমতা—যে ক্ষমতা সমাজের যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও উদ্যোগ আত্মসাৎ করে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অসাম্যের সৃষ্টি করে। এ দুয়ের কোনটাই গণতন্ত্রের পক্ষে সঙ্গত নয়। সমাজ-নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগ বাজার অর্থনীতির সঙ্গে বা বহুদলীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে চলতে পারে কিনা এখনও স্পষ্ট নয়। সমাজবাদী গণতন্ত্রের একমাত্র উদাহরণ 1945-এর পরের উত্তর ও পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলি। সেখানেও পুঁজিবাদকে বাতিল না করে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

10. সংখ্যাগুরুর মতামত কি সবসময় গণতান্ত্রিক ?

গণতন্ত্র আর সংখ্যাগুরু-শাসনকে এক ভাবা ভুল। আক্ষরিক অর্থে গণতন্ত্রের মানে গণ বা সমস্ত মানুষের শাসন—একে অন্যের উপর শাসন চালালে তা গণতান্ত্রিক নয়। মানে, গণতন্ত্রের মোদ্দা ব্যাপারটাই হল সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার যেন সবাই সমানভাগে পায়। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর মত শুধুমাত্র এক পদ্ধতি—যখন আলাপ-আলোচনা, পরিবর্তন-পরিমার্জন, আপস মীমাংসা বা অন্য কোন উপায়ে মতান্তর রোধ করা যায় না, তখন সংখ্যাগুরুর মতের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়। অবশ্যই, সংখ্যালঘুর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার থেকে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া নিঃসন্দেহে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সংখ্যালঘুদের দমন করে রেখে তাদের মতামতকে নস্যাৎ করা হবে। সংখ্যালঘুর মতকে নস্যাৎ করে সংখ্যাগুরুর মতের সাহায্যে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় বটে কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

বিনিময় তত্ত্ব

সংখ্যাগুরু-শাসনের সমর্থকরা বলেন, এখন যারা সংখ্যালঘু তারা পরে সংখ্যাগুরু হতে পারে এবং এখনকার সিদ্ধান্তে নির্বাচনে তাদের প্রভাব না থাকলেও পরে তারা জিততে পারে। সংখ্যালঘুর দ্বারা সংখ্যাগুরুর মতের সমর্থন নির্ভর করে বিনিময়ের ভিত্তিতে,

অর্থাৎ পরে যখন তারা সংখ্যাগুরু হবে তখন অন্যরাও তাদের সমান সমর্থন যোগাবে। অবশ্য, এই বিনিময়-তত্ত্ব অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় কিছু ক্ষেত্রে—যেমন, সংখ্যাগুরু যদি সংখ্যালঘুদেব প্রচারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বা যদি সংখ্যালঘুত্ব যদি 'স্থায়ী' হয় বা এমন কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে জেতার পরেও সেই ক্ষতি পূরণের পরে কোন উপায় না থাকে। বিষয়গুলি আলাদা আলাদা করে বিচার করার দরকার।

সংখ্যাগুরু ও ব্যক্তির অধিকার

যখন সংখ্যালঘু বা তাদের সরকার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীব মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকাবে হস্তক্ষেপ করে, তখন সেই কাজকে নিশ্চিতরূপে গণতন্ত্রবিরোধী বলা হবে। রাজনৈতিক জীবনে মানুষের যোগদানের প্রয়োজনেই মৌলিক অধিকার—যেমন, কথা বলার, চলাফেরাব বা সভা-সমিতি কবাব অধিকার; ভোট দেওযার ও সরকারি পদের জন্য দাঁড়াবার অধিকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাব বুনিয়াদ এই অধিকারগুলি সমানভাবে পাওয়ার নিশ্চয়তার উপর দাঁড়িয়ে। সংখ্যাগুরুর হস্তক্ষেপের হাত থেকে বাঁচতে এই অধিকারগুলিকে সংবিধান বা অধিকারনামার আওতায় রাখা হয়। সমস্যা হয় যখন এই অধিকার বিশেষ প্রয়োজনে সার্বজনীনভাবে বাতিল করার বা নিয়ন্ত্রিত কবাব দবকার হযে পড়ে। এই ব্যাপারে পরে আলোচনা হবে (প্রশ্ন 59-61)।

স্থায়ী সংখ্যালঘু

দ্বিতীয়ত যখন জাতি, ধর্ম, ভাষা বা অন্যান্য কারণে সংখ্যালঘুত্ব স্থায়ী রূপ নেয় তখন বিনিময় তত্ত্ব কাজ করে না। যখন দলীয় প্রতিযোগিতা সংখ্যালঘু স্বার্থের উপরে উঠে সবাইকে না মিলিয়ে বিভাজনের ভিত্তিতে চলে তখন সংখ্যালঘুদের প্রভাব বা সরকার গঠনের ক্ষমতা বরাবরের মত লোপ পায়। এই অবস্থা রুখবার জন্য নানা সংবিধানিক উপায় আছে—যেমন, আনুপাতিক হারে সরকারি কাজে শরিক হওয়া বা যেসব আইন বিশেষকরে সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতিকূল তাতে 'ভেটো' প্রয়োগ বা বিশেষ নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা, বা তাদের নিজস্ব কিছু ব্যাপারে স্বশাসনের অধিকার দেওয়া। এর মধ্যে কোনটা বেশি কার্যকর তা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। যে উপায়েই সংখ্যালঘুর স্বার্থ সুরক্ষিত হোক না কেন, নিজস্ব সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার অধিকার আজ মৌলিক অধিকারের আওতায় পড়ে এবং তার জন্য সংবিধানিক সুরক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করা হয় (63 নং প্রশ্ন দেখুন)।

ঐকান্তিক সংখ্যালঘু

শেষ পর্যন্ত আসা যাক ঐকান্তিক সংখ্যালঘুদের কথায়। একটি গোষ্ঠী মনে করতে

পারে কোন একটি বিষয়ের গুরুত্ব এতই বেশি যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা তা উপলব্ধি করতে না পারলেও বিষয়টির গুরুত্ব তো হ্রাস পায়ই না বরঞ্চ অন্য কোন ক্ষেত্রে তাদের সমর্থনও এই ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। অর্থাৎ এই ধরণের কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাকে কোন মতেই বিধিসম্মত বলা যাবে না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠরা যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তারা যতদূর সম্ভব সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করবে, একান্তই যদি তা অসম্ভব না হয়। একই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে তারা এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না যাতে সংখ্যালঘুদের বক্তব্য উপেক্ষিত হয়। গণতন্ত্র তখনই টিকে থাকতে পারে যখন সমস্ত মানুষ একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিস্থিতিতে সব থেকে বেশি প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের সরকারের আত্ম নিয়ন্ত্রণ। লক্ষ্য রাখা উচিত সংখ্যার জোরে তারা যেন সব কিছু আত্মসাৎ করে নিতে না পারে বা তাদের জনমত অন্যদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে না পারে।

11. গণতন্ত্রে আইন অমান্য করা কি ব্যক্তির পক্ষে বৈধ?

আইন অমান্য করা অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বা বিশেষ স্বার্থের সমর্থনে অহিংস আইন অমান্য গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে এসেছে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা আইনভঙ্গ করেও শাস্তি মাথা পেতে নিতে ভয় পান না। তাঁদের সঙ্গে আইন সহকারী অপরাধীদের পৃথক করা অবশ্য কর্তব্য। সাধারণত গণ আইন অমান্য করা হয় সরকারি বা শক্তিশালী বেসরকারি কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও অশালীন আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, তাদের নীতি বা আচরণ বদলে বাধ্য করতে। আবেদন-নিবেদন কিম্বা প্রচার অভিযানেও যখন কাজ হয় না তখনই শেষমেষ আইন অমান্য করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গণ প্রতিরোধের সাহায্যেও অসঙ্গত নীতিকে নিষ্ক্রিয় করে তোলা যায়। সে যাই হোক, আইন অমান্য করলে বিনিময় তত্ত্ব অস্বীকার করা হয় অর্থাৎ গণতন্ত্রে আইনের ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেওয়া হয় সেইজন্য অনোন্যপায় না হলে এই চরম পন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়।

আইনের বিশুদ্ধতা

যাঁরা আইন-অমান্য করার বিরোধী তাঁদের বক্তব্য আইন ভাঙা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁরা বলেন, আইন হল সভ্য সমাজের ভিত্তি; কোন এক দল অমান্য করলে অন্যরাও তা করতে থাকবে। যদি প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত আইন বানাতে থাকে, তাহলে সর্বজনীন আইনের কাঠামোতে ফাটল ধরবে। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের হাতে সাংবিধানিক উপায়ে আইন বদলাবার অধিকার আছে—যেমন নির্বাচন, প্রতিনিধিদের উপর চাপ সৃষ্টি করা, আইন মাফিক প্রচার চালানো যাতে নাগরিক ও সরকারকে বাধ্য করানো যায় অন্যায় আইন বা নীতি বদলাতে। তাছাড়া, নির্বাচনে

ভাগ নিয়ে লোকে বিজেতার ঘোষিত নীতির উপর আস্থা আগে থেকেই জানিয়ে রাখে। আইন অমান্য তাই যেমন গণতন্ত্র-বিরোধী তেমনি 'আইনের শাসন'-কে অবমাননা।

আইন ও ন্যায়

আইন—অমান্যের অধিকারের পক্ষে বলা হয়, নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়ার মানে এই নয় যে সরকার যত অন্যায় নীতি বা আইন প্রয়োগ করুক তাও মেনে নিতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে অপূরনীয় ক্ষতির সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংবিধানিক উপায়ে প্রচার বা প্রতিবাদ করতে গেলে ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যায়কে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে 'দখা যায় যে সরকারি ও বেসরকারি কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর প্রচারের সামনে সাধারণ মানুষের বক্তব্য তলিয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে আইন অমান্য করলে গণতন্ত্র জোরদার হয়, কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রত্যেককে নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। হাজার হোক, ব্যক্তি মানুষের নৈতিক চেতনাই ঠিক করে দেয়, কি ন্যায় বা কি অন্যায়, এবং তা অযৌক্তিক, অন্যায় আইন বরদাস্ত করে কখনই সম্ভব নয়। ইতিহাসের শিক্ষা, নৈতিক বিরোধিতা না করে উদাসীন হয়ে থাকলে, বা দমনমূলক আইন মেনে নিলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

ব্যক্তি চেতনা

সাধারণভাবে এই মতভেদের মীমাংসা সম্ভব নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি, সামঞ্জস্য ও পরিণাম বুঝে সমীক্ষার দরকার। শেষমেষ এটা নির্ভর করে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সঙ্কল্পের উপর। অন্তত একটি ক্ষেত্রে—সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে—নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যক্তিগত অধিকার সরকারিভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। অনেক রাষ্ট্রেই বিকল্প-ব্যবস্থা তৈরি করে সেনাবাহিনীতে যোগ না দেওয়ার নৈতিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

12. জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোন যোগ আছে কি ?

অনেকে বলেন, আজকের .'দনে দুটি প্রতিযোগী মতবাদ হল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র। তাঁরা ভুলে যান যে এ দুয়ের ঐতিহাসিক ও ভাবগত উৎপত্তি এক—ফরাসি বিপ্লবের সেই যুগান্তকারী আবেদন যে মানুষই সব রাজনৈতিক শক্তির উৎস। জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব বলে, মানুষের স্বশাসন তার রাষ্ট্রসীমার মধ্যে। গণতান্ত্রিক এই বলে দেশের মানুষ নিজস্ব ব্যাপারে স্বাবলম্বী হবে। এই দুয়ের মিল অনস্বীকার্য। মানুষ যদি শাসক হয়, তাহলে মোদ্দা রাজনৈতিক প্রশ্নটা দাঁড়াল—কে এই মানুষ বা জনগণ।

জাতীয়তাবাদ ও বহিষ্কারতত্ত্ব

ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। যেখানে গণতন্ত্র সব বিভেদের উর্ধ্বে সাধারণ মানুষের স্বাধিকারের দাবিতে এক সর্বজনীন আদর্শের প্রচার করে, সেখানে জাতীয়তাবাদ নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে সংস্কৃতি, পরম্পরা ও জীবনযাত্রার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা করে দেখে। জাতীয়তাবাদ আলাদা করে, গণতন্ত্র মেলায়। বহিষ্কারতত্ত্ব তাই মূলত গণতন্ত্রবিরোধী কারণ তা ভাষা, ধর্ম ও জাতিবাদের নামে অসংখ্য জাতি গোষ্ঠীকে তাদের জন্মভূমিতেই নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। যদি সব রাষ্ট্রসীমা নির্দিষ্ট এক জনগোষ্ঠী বা জাতির সঙ্গে মিলে যায় তাহলে কোন সমস্যা থাকে না। বাস্তবে দেখা যায়, শত শত বছরে লোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে সেখানে বসবাস করেছে এবং জয়-বিজয়ের ফলে কোন দেশেই বিশেষ কোন রাষ্ট্রীয় বা জাতি গোষ্ঠীর ভিত্তিতে জাতি-রাষ্ট্র গড়া সম্ভব হয় নি।

জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক অধিকার

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রগত স্বাধিকারের দাবি গণতান্ত্রিক হলেও বহিরাগত স্থায়ী বসবাসকারীদের সমান রাজনৈতিক অধিকারের দাবি বা সংখ্যালঘুদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বশাসনের দাবি অগণতান্ত্রিক নয়। তাছাড়া, এসব দাবি অস্বীকার করলে দেশের অভ্যন্তরে বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে,.তাই কোন দেশ অভ্যন্তরীণ মামলা বলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে পারে না। মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার আজ মানবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং তার স্বীকৃতির অভাব আজ সমগ্র মানবসমাজের চিন্তার বিষয়। কাজেই প্রয়োজন হলে তা আন্তর্জাতিক মানবসমাজের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে। রাষ্ট্র ও জাতিগত বহিষ্কারতত্ত্বের মূল্যায়ন আজ সর্বজনীন মানবতার ভিত্তিতে করতে হবে।

13. যে কোন দেশ কি গণতান্ত্রিক সরকার অর্জনে সক্ষম?

উনিশ শতকের উদারবাদী দার্শনিক জে. এস. মিল বলেছিলেন, সভ্যতায় উৎকর্ষ এলেই গণতান্ত্রিক সরকার সম্ভব। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পশ্চিমী দেশের বাইরের, লোকেরা স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্য নয়; তাদের প্রয়োজন পশ্চিমের তত্ত্বাবধানে সদাশয় স্বৈরতন্ত্রের। সেই সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এ ধরণের জাতিবৈষম্যমূলক বিচার মানতেন। যদিও শিক্ষা শাসক-শাসিতের বিভেদ মিটিয়ে গণতন্ত্রকে মজবুত করে, তবুও এমন কোন প্রমাণ নেই যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে মানুষের বুদ্ধিমত্তা লোপ পায় বা তাদের নিজস্ব ব্যাপারে বিচারশক্তি হারিয়ে যায়, নিজেদের দায়-দায়িত্ব তারা নিজেরা বুঝে নিতে পারে না। আর স্বৈরতন্ত্র? তা সে ঔপনিবেশিক বা অভ্যন্তরীণ যাই হোক না কেন, আজ পর্যন্ত কখনই সদাশয়তার ধারকাছ দিয়ে যায় নি।

গণ-সংগ্রাম

ইতিহাসের শিক্ষা এই যে দীর্ঘকালীন ও রক্তক্ষয়ী গণ-সংগ্রাম বা প্রস্তুতি ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব হয় নি। মৌলিক আশা-আকাঙ্খার চরিতার্থ করতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজন—একথা সাধারণ মানুষকে অনুধাবন করতে হবে, এবং প্রয়োজনে তাকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। মোদ্দা কথা, গণতন্ত্র হাতের মোয়া নয়। পুরুষানুক্রমিক শাসক, সৈনিক একনায়ক, কম্যুনিস্ট প্রশাসক, আজীবন রাষ্ট্রপতি, বিদেশি দখলকারী—কেউ স্বেচ্ছায় রাজশক্তি ছেড়ে যায় নি। তারা ছেড়েছে কলঙ্কিত হয়ে এবং যখন জন-বিক্ষোভ তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে ক্ষমতায় থাকলে অরাজকতা বাড়বে এবং শাসন চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আন্তর্জাতিক সমর্থন

বিদেশের গণতান্ত্রিক সমর্থন গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়ে এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান কায়েম করতে অবশ্যই সাহায্য করে। একথা ঠিক যে শীতল যুদ্ধ চলাকালীন পশ্চিমী গণতন্ত্রের লক্ষ্য ছিল সাম্যবাদের প্রসারে বাধা দেওয়া এবং তা করতে তারা কিছু অগণতান্ত্রিক শক্তিকে মদত যুগিয়ে এসেছে। শীতল যুদ্ধের অবসানে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সরকারেব সমর্থন নিশ্চিতভাবে এক নতুন আন্তর্জাতিক ভারসাম্য গড়ে তুলেছে। যদিও এই সমর্থনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য তবুও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের নিজস্ব সংগ্রামের বিকল্প কখনই নয়। বস্তুত বাইরের থেকে চাপানো স্বাযত্তশাসন ব্যাপারটাই স্ববিরোধী এবং তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

14. অভীষ্ট সিদ্ধির পর গণতন্ত্রকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়?

কোন সোজা রাস্তা নেই। সামন্ত শ্রেণীর বিরোধ, সামরিক একনায়কতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদ অতিক্রম করে পশ্চিমী দেশে গণতন্ত্র স্থায়ী হতে অনেক সময় লেগেছে। সাম্প্রতিক গণতন্ত্রগুলির পক্ষে অবস্থা আরও সঙ্গীন হতে পারে। যেখানে সমাজ বৈষম্য এত মজ্জাগত যে মুক্ত রাজনীতিক ব্যবস্থা ওলট পালট করে দিতে পারে। সেইসঙ্গে নিদারুণ দারিদ্র বাধা হতে পারে মানুষের ন্যায্য চাহিদা মেটাবার পক্ষে। কিংবা শক্তিশালী সেনাবাহিনীর পক্ষে রাজনৈতিক শক্তি কব্জা করার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

গণতান্ত্রিক সুদৃঢ়তা

তার মানে এই নয় যে প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ শক্তিহীন। গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে সুদৃঢ় করতে এবং গণতন্ত্রের উপরে আঘাত সামলাতে নানা উপায় অবলম্বন করা যায়। বিচার-বিভাগ বা আইনের রক্ষাকর্তা, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, নির্বাচন অধিকারিক

প্রমুখ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের শিক্ষা ও উৎকর্ষের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। এ ছাড়া প্রয়োজন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার ও দলীয় কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের। নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন যেমন প্রচার মাধ্যম, ব্যবসায়িক সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, অন্য কোন বেসরকারি সংগঠন যাতে রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেদিকেও নজর রাখা দরকার। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দক্ষতা ও সততা, গণতান্ত্রিক-সংবিধানিক রাজনীতিতে তাঁদের আস্থা, বর্তমান সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং গদিতে আসীন থাকার যোগ্যতার উপরও বিষয়টি নির্ভরশীল।

দ্বিমুখী সংগ্রাম

গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে দ্বিমুখী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। একদিকে লড়াই সেইসব গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যারা কখনই মুক্ত শাসনব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক প্রভাব বরদাস্ত করতে পারে না। অন্যদিকে গণতন্ত্রকে যারা ক্ষমতার লড়াই বা সরকার দখলের প্রতিযোগিতা বলে মনে করে—সেই সব 'ঘরের শত্রু'-র বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। প্রথম সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল ও সংগঠনের বিস্তারের উপর। দ্বিতীয়টির সাফল্য নির্ভর করে ক্ষমতার প্রয়োগে আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিরোধীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার ইচ্ছা ও সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে অন্যের রাজনৈতিক অধিকারকে মর্যাদা দেওয়ার আগ্রহের উপর।

15. কার্যকর গণতন্ত্রের আবশ্যক উপাদানগুলি কি কি?

কার্যকর গণতন্ত্রের আবশ্যক উপাদান চারটি—বৈধ ও অবাধ নির্বাচন, উন্মুক্ত ও দায়বদ্ধ সরকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক বা নাগরিক সমাজ। এই উপাদানগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ আগে করা হয়েছে বটে, তবে এগুলির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। চারটি উপাদান নিয়ে গণতন্ত্রের কাঠামোটি একটি পিরামিড-এর মত এবং এই পিরামিড ধরে রাখতে প্রতিটি উপাদানের প্রয়োজন সমান (1 নং নকশা দেখুন)।

1 নং নকশা : গণতন্ত্রের পিরামিড

বৈধ ও অবাধ নির্বাচন

সরকারি পদাধিকারীদের জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকতে ও জবাবদিহি করতে বাধ্য করার প্রধান উপায় হল নির্বাচনী ব্যবস্থা। সরকারি চাকরি পাওয়ার সমান সুযোগ এবং প্রতিটি ভোটের সমান মূল্য যে নীতিতে সুরক্ষিত থাকে সেই রাজনৈতিক সমতার আদর্শের পক্ষেও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা জরুরী। বৈধ ও অবাধ নির্বাচনের প্রথম শর্ত হল নির্বাচনী ব্যবস্থা যথা কোন কোন দফতরে নির্বাচন প্রয়োজন, ভোটে কারা দাঁড়াতে পারে, কখন ভোট হবে, কারা ভোট দেবে, নির্বাচন কেন্দ্রের সীমা কিভাবে নির্ধারিত হবে, কি পদ্ধতিতে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে ইত্যাদি। বৈধ ও অবাধ নির্বাচনের দ্বিতীয় শর্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া যথা ভোটার তালিকা তৈরি, প্রচার থেকে শুরু করে ব্যালট গণনা পর্যন্ত প্রতিটি ভোট কিভাবে পরিচালিত হবে। প্রতিটি নির্বাচন আইন মাফিক হচ্ছে কি না এবং ভোটের ফল নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো কোনও দুর্নীতি হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্যই এইভাবে নির্বাচন পরিচালনা দরকার।

মুক্ত ও দায়বদ্ধ সরকার

গণতান্ত্রিক জবাবদিহির এক অর্থ এই যে সরকারকে *আইনত* জনতার কাছে জবাব দিতে হবে, মানে সরকারি পদাধিকারীকে আদালতের সামনে আইন পালন সম্বন্ধীয় প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ('আইনের শাসন')। অপর অর্থে তাদের রাজনৈতিক স্তরে জবাব দিতে হবে, মানে সরকারি নীতি ও কাজের সমর্থনে জনতার কাছে এবং সংসদের সামনে জবাব দিতে হবে। এই জবাব পাওয়া তখনই সম্ভব, যখন আদালত সরকারি আওতার বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে সংবিধানের রক্ষা ও দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দিতে পারবে এবং সংসদও স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন, কর আদায় ও সরকারের কাজের সমীক্ষা করতে পারবে। জবাব দেওয়া ছাড়াও, গণতান্ত্রিক সরকারকে সংবেদনশীল হতে হবে—আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আণুষ্ঠানিক ভাবে মেনে নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে জন মতের প্রসার খোলামনে স্বীকার করতে হবে।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার

মতপ্রকাশ, সভা-সমিতি গঠন, চলা-ফেরা ইত্যাদি যত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত তার প্রকৃত প্রয়োজন মানুষকে রাজনৈতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে যাতে নাগরিক সমাজে তারা নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে পারে এবং সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদিও এই অধিকারগুলি মানবিক অধিকারের আওতায় পড়ে এবং আইনত পায় *ব্যক্তি-মানুষ*, তবুও এর মূল্য *সমগ্রের* কাজের মধ্যে ধরা পড়ে যেমন, সর্বজনীন লক্ষ্যে, প্রচার, জনমত গড়ে তোলা ইত্যাদি। কাজেই ব্যক্তি-অধিকারকে সামগ্রিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থি ভাবা বা সামগ্রিক সিদ্ধান্ত ও গণ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী

মনে করা ভুল। বস্তুত, ব্যক্তি-অধিকারের ভিত্তিতেই সামগ্রিক সত্তার বিকাশ সম্ভব।

গণতান্ত্রিক বা 'নাগরিক সমাজ'

'নাগরিক' সমাজের ধারণা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব ধরণের সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রের আওতার বাইরে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে হবে। এইভাবেই রাষ্ট্র সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, উপর থেকে না চাপিয়ে জনমতকে নীচে থেকে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া এবং স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব। তার মানে এইসব সামাজিক সংগঠনগুলিকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যপারেও গণতান্ত্রিক হতে হবে। সমাজ যদি স্বৈরতান্ত্রিক হয় তাহলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্র খুঁটি নড়বড়ে হয়ে যাবে। মানুষ যদি পরিবারে, স্কুলে বা ধর্মস্থানে স্বৈরতন্ত্রের শিকার হয়, যদি তারা কর্মক্ষেত্রে বাসস্থানে বা অন্যত্র একসঙ্গে মিলেমিশে চলতে না পারে বা স্বায়ত্ত শাসিত সংগঠনের অভিজ্ঞতা তাদের না থাকে, তাহলে তাদের পক্ষে সক্রিয় নাগরিক হওয়া মুশকিল বা বৃহত্তর সমাজের দায়িত্ব অনুধাবন করা অসম্ভব।

2

বৈধ ও অবাধ নির্বাচন

16. নির্বাচনের প্রয়োজন কেন?

জাতীয় স্তরে নির্বাচনের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমটি হল সরকারের প্রধান বা মুখ্য প্রশাসককে নির্বাচন করা এবং সাধারণভাবে সেই সরকারের নীতি কি হবে তা স্থির করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল প্রতিনিধিসভা-আইনসভা বা সংসদের সদস্যদের বাছা যারা আইন ও করনীতি তৈরি করবে এবং জনগণের হয়ে সরকারের কাজকর্ম পর্যালোচনা করবে। রাষ্ট্রপতি প্রথায় অর্থাৎ যেখানে রাষ্ট্রপতিই সরকারের প্রধান—এই দুটি উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে পূরণ করা যায়। এই প্রথায় প্রেসিডেন্ট ও আইনসভার সদস্য বাছাইয়ের জন্য আলাদা আলাদা নির্বাচন হয়। দুটি নির্বাচন একই সময়ে নাও হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বা সংসদীয় প্রথায় একদফা নির্বাচনেই দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কোন দলনেতা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় করতে পারছেন তার ভিত্তিতে আইনসভার বা সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সরকারের প্রধান কে হবেন তা স্থির করেন।

নির্বাচন ও গণনিয়ন্ত্রণ

অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি পদাধিকারীদের নিয়মিত নির্বাচনই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে গণনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার মুখ্য উপায়। নির্বাচন প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস সাধারণ মানুষ, তাদের আস্থাভাজন হয়ে তবেই ক্ষমতা ধারণ সম্ভব এবং রাজনীতিবিদরা তাঁদের কাজের কৈফিয়ত জনগণকে দিতে বাধ্য। গদি যাওয়ার আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত রাজনীতিবিদদের জনগণের আস্থার মর্যাদা দিতে, সরকারি পদের মান বজায় রাখতে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সরকারি নীতি ও প্রশাসনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে বাধ্য করে।

17. রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন কি প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন?

রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি হওয়া উচিত মুখ্যত আনুষ্ঠানিক এবং প্রতীকী। দলীয় প্রতিযোগিতার উর্ধ্বে জাতীয় একতার প্রয়োজনে, সরকার পরিবর্তন সত্ত্বেও রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্থায়িত্বের

প্রয়োজনে এবং সামরিক আইন-প্রণয়নের উর্ধ্বে সংবিধানকে স্থায়িত্ব দিতে এটা জরুরি। রাষ্ট্রের সংকটকালে বা সংবিধান নিয়ে বিতর্ক উঠলে এই প্রতীকী পদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায় অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান তখন তাঁর ইচ্ছামত নিজস্ব বিবেচনা শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন।

ব্যবস্থাভেদে তারতম্য

রাষ্ট্রপতি-প্রথায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে আণুষ্ঠানিক কাজ ও সরকারের প্রধান হিসেবে কাজ একত্রে করেন (যেমন রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে)। সংসদীয় প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রের প্রধান প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বা সংসদের দ্বারা নির্বাচিত হতে পারেন বটে তবে তাঁর হাতে কার্যকরী ক্ষমতা থাকে না (যেমন জার্মানি, আয়ারল্যাণ্ড, ভারত ইত্যাদি)। সংবিধানিক রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের প্রধান তাঁর পদটি পান বংশপরম্পরায় এবং আজীবন সেই পদে আসীন থাকেন (যেমন বেলজিয়াম, স্পেন বা ইংল্যাণ্ড)।

শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা

এর মধ্যে কোনটা যে শ্রেষ্ঠ তার কোন সোজা উত্তর নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণাগুণ খতিয়ে দেখতে হবে সংবিধানিক ব্যবস্থার পরিপ্রক্ষিতে। কার্যপালিকা রাষ্ট্রপতির অসুবিধা হল, এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান দৈনন্দিন রাজনীতি, জনরোষ বা নিষ্ফল নীতির উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। অপরদিকে, অনির্বাচিত রাজতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক বলা মুশকিল, বিশেষত যদি তা জমিদারি ব্যবস্থা বা সামন্ত্রতন্ত্রের প্রতিভূ হয়। অন্তত পক্ষে, রাজতন্ত্রকে জনমতের আওতায় আনা উচিত এবং তার ক্ষমতার সীমা লিখিত সংবিধানে বেঁধে দেওয়া দরকার।

18. আর কোন কোন সরকারি পদে নিয়োগ নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়া উচিত?

সরকারি চাকুরেদের আচরণ ও দক্ষতার যাবতীয় দায়িত্ব নির্বাচিত প্রধান শাসন বিভাগের। মুখ্য শাসনবিভাগ তাদের আচরণের জন্য একই সঙ্গে সংসদ ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। তাই শাসনবিভাগের সদস্যদের নীচ থেকে নির্বাচন না করে উপর থেকে নিয়োগ করার সপক্ষে জোরালো যুক্তি দেওয়া হয়। তবে মুখ্য শাসনবিভাগকে উপর থেকে নিয়োগ করার যুক্তি যাঁরা দেন তাঁরাও বলেন, শাসনবিভাগে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ সমাজের যে কোনও যোগ্য ব্যক্তির থাকা উচিত। গণতন্ত্রে অবশ্য স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকারী পরিসেবার প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুলিশি ব্যবস্থা ইত্যাদি স্থানীয় পরিসেবা তদারকির জন্য দরকার নির্বাচিত

প্রতিনিধি যারা একইসঙ্গে স্থানীয় সরকারের বা প্রশাসনের দায়িত্বগ্রহণ করবে।

নির্বাচন ও বিচারবিভাগ

বিচারবিভাগও কি নির্বাচিত হওয়া উচিত? প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে আইনসভা ও মুখ্য শাসন বিভাগের মত বিচারবিভাগও নীচ থেকে নির্বাচিত হওয়া উচিত। কিন্তু বিচারবিভাগের কাজ রাজনৈতিক নয় আইন সংক্রান্ত। জনপ্রিয়তা অর্জন বিচারবিভাগের উদ্দেশ্য নয়। তার প্রয়োজন সঙ্গতি রেখে নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের জন্য। বিচারবিভাগের কার্যকালের মেয়াদ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। সমাজের বিশেষ কোন শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতা বিচারবিভাগের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। আইন এবং দণ্ডবিধি যাতে জনগণের মতামতের কথা মাথায় রেখে প্রণয়ন করা হয় তা নিশ্চিত করা সংসদের দায়িত্ব, বিচারবিভাগের নয়। তবে বিচারবিভাগে নিয়োগের পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ ন্যায্য উদ্বেগের বিষয়। বিশেষত যদি সেই পদ্ধতি সমাজের বড় অংশ যেমন মহিলা বা অন্য জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসুবিধার কারণ হয় (বিচারবিভাগে নিয়োগের বিষয়টি 40 নম্বর প্রশ্নে আলোচনা করা হয়েছে)।

19. সংসদে কি একাধিক নির্বাচিত কক্ষ থাকা উচিত?

সংসদের প্রথম কক্ষের থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত দ্বিতীয় একটি কক্ষের প্রয়োজনের কথা বলা হয় আইন প্রণয়নের কাজে পূর্ণ বিচার-বিবেচনা ও সমর্থনের কথা ভেবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়—যেখানে দ্বিতীয় কক্ষে সদস্য রাজ্যগুলির স্বার্থ প্রতিফলিত হয়—সেখানে এটি বিশেষত জরুরী। ব্যক্তি অধিকারের সংবিধানিক নিশ্চয়তা ছাড়া আইন প্রণয়নে এই দ্বিতীয় কক্ষ কার্যকর বাধা তৈরি করতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের নির্বাচন

সংসদের দুই কক্ষের নির্বাচন পদ্ধতি সাধারণত ভিন্ন হয়। সংসদের উচ্চকক্ষে নির্বাচন হয় পরোক্ষ বা পৃথক নির্বাচনী-কেন্দ্রের ভিত্তিতে বা পৃথক সময়ের ব্যবধানে। সংসদীয় ব্যবস্থায় নিম্নকক্ষের সরাসরি নির্বাচনেই সরকারের গণসমর্থন ও বৈধতার ভিত্তি। তাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদাধিকার এই নিম্নকক্ষেরই। কোন আইন কিছুদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখা বা ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা অবশ্য উচ্চকক্ষের রয়েছে। গণতন্ত্রে অনির্বাচিত দ্বিতীয় কক্ষের কোনও স্থানই থাকা উচিত নয়।

20. নির্বাচন কত ঘন ঘন হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উনিশ শতকে ইউরোপের আমূল সংস্কারবাদীদের দাবি ছিল, জনপ্রতিনিধিদের উপরে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সংসদীয় নির্বাচন হোক বাৎসরিক। কিন্তু দেখা গেল

যে সরকার ও সংসদের কাজকর্ম ঠিকমত চালাতে গেলে, অর্থনীতি বা শাসননীতি ঠিকমত রূপায়িত হচ্ছে কি না বিচার করতে হলে এক বছর যথেষ্ট সময় নয়। একদিকে সরকারের হাতে কাজ করার মত যথেষ্ট সময় ও অন্যদিকে সেই সব কাজের জন্য তার দায়বদ্ধতা—এই দুয়ের সামঞ্জস্য আনতে সাধারণত চার বছর পর পর নির্বাচন করা হয়।[1]

নির্বাচনের সময়

সময়কাল যাই হোক না কেন, নির্বাচন কোন সময়ে হবে ক্ষমতাসীন সরকার তা কখনই স্থির করবে না। এই নিয়ে পরে আলোচনা হবে (প্রশ্ন 31)। তবে, 'মুক্ত ও পক্ষপাতহীন' নির্বাচনের মূল সিদ্ধান্ত হল—নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর ক্ষমতাসীন দলের কোনরকম নিয়ন্ত্রণ থাকবে না বা তারা কোন বাড়তি সুযোগ-সুবিধে নিতে পারবে না। নির্বাচনের সময় ও ব্যবস্থাপনা সরকারি এক্তিয়ারের বাইরে রাখা দরকার।

21. ভোটাধিকার থেকে কি কাউকে বঞ্চিত করা উচিত?

সাধারণত যাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তারা হল শিশু, অপরাধী ও বিদেশি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কারণ দেখানো হয়। কোন এক বয়সসীমার নীচে শিশুদের বঞ্চিত করার যুক্তি আর কিছুই নয়—সাধারণ জ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। বেশির ভাগ শিশু, অবিভাবকদের সাহায্য ছাড়া কোন দীর্ঘকালীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, বা তাদের জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার পরিধি সীমিত। অধিকাংশ সমাজে শৈশবের সমাপ্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের কিছু অধিকার এক সঙ্গে পাওয়া যায়—যেমন বিবাহ, সম্পত্তি, সংবিধানিক ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার কিম্বা ভোট দেওয়ার অধিকার। সাধারণত আঠেরো বছর বয়সে এইসব অধিকার পাওয়া যায়—আবার এই বয়সটাই স্কুল পাস ও সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সময়।

নির্ধারিত বয়স সীমা

বয়সসীমা নির্ধারণের বিষয়টা মনে হয় যেন জোর করে চাপানো। এ কথাও প্রমাণিত যে আগের তুলনায় এখনকার শিশুরা অনেক তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে ওঠে। কিছু ক্ষেত্রে যেমন রোজগারের ব্যাপারে আঠেরো বছরের আগেই তারা অধিকার পেয়ে যায়। দুঃখজনক হলেও ব্যাপারটা সত্যি যে ছোটদের দায়িত্ব বড়দের হাতে থাকা সত্ত্বেও বড়দের হাত থেকে সুরক্ষার খাতিরে নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শিশুদেরও থাকা উচিত। তাছাড়া সাবালকত্ব হঠাৎ আসে না—এ এক

---

1 ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি লোকসভার মেয়াদ পাঁচ বছর।—পৃ: 36

নিরন্তর প্রক্রিয়া। কাজেই শৈশবেও পরিবার বা স্কুলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে তাদের যোগদানের পথ সুগম করে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের প্রশিক্ষণ শুরু করে দেওয়া উচিত। যাই হোক, এ সব কারণ সত্ত্বেও বলা যায় যে নির্বাচনে ভোটের অধিকার আঠেরো বছরের নীচে না দেওয়াই ভাল। সমাজের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী সবার পক্ষে একই বয়সে একই অধিকার ও মান্যতা অর্জন করার মধ্যে এক প্রতীকী তাৎপর্য আছে।

অপরাধী ও ভোট

শাস্তি পাওয়া অপরাধীদের ভোটাধিকার না দেওয়ার যুক্তি এই যে যারা আইন ভঙ্গ করেছে তাদের আইন তৈরির অধিকার দেওয়া যেতে পারে না। অন্যদিকে এমন তর্কও উপস্থিত করা যায় যে তাদের স্বাধীনতা হরণের অর্থ এই নয় যে তাদের নাগরিক অধিকারও হরণ করা যেতে পারে। বরং অপরাধীদের বেআইনি ও অমানুষিক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সান্নিধ্যের আনা দরকার।

বসবাসকারী বিদেশি

সবথেকে বিতর্কিত হল কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিদেশিদের ভোটাধিকারের প্রশ্নটি। যদি আমরা মেনে নিই যে আঠেরো শতকে গণতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকারের বংশগত উত্তরাধিকারের বিরোধিতা করা হয়েছিল তাহলে শুধুমাত্র জন্ম ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার নির্ধারিত হওয়া অযৌক্তিক। যারা আইনত স্থায়ী বসবাসকারী তারা কেন নাগরিকত্ব পাবে না? বিতর্কের বিষয় হল: স্থায়ী বসবাসকারী বলতে কত বছর বসবাসের কথা বোঝাবে? পাঁচ বছর সময়সীমা মনে হয় যুক্তিযুক্ত।

22. ভোটার নথিভুক্তির পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

ভোটার নথিভুক্তির ব্যাপারটা কেবল পদ্ধতিগত বলে মনে হলেও আসলে এর সঙ্গে ভোট দেওয়ার অধিকার অঙ্গাঙ্গীযুক্ত। নির্বাচনের আগে ভোটারদের নামের একটি তালিকা বা নথি তৈরি কেন প্রয়োজন তার কারণগুলি খুবই সহজ। প্রতিটি ভোটারকে আলাদা করে সনাক্ত করা এবং যে যে ভোট দিয়েছে তাদের নামের হিসাব রাখা জরুরি যাতে কেউ দু'বার ভোট দিতে, অধিকার ছাড়াই ভোট দিতে বা অন্যের ভোট দিতে না পারে। তবে নথিভুক্তির পদ্ধতি নানা কারণে ভোটারদের তালিকায় নাম লেখানোর ব্যাপারে অথবা ভোট দিতে নিরুৎসাহ করতে পারে। নথিভুক্তি জনগণের ইচ্ছা এবং রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উদ্যোগের উপর নির্ভর করতে পারে। নির্বাচনের খুব বেশিদিন আগে নথিভুক্তি হয়ে থাকলে তা হয়তো পুরনো হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

আবার, নথিভুক্তি রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রয়োজনেও করা হতে পারে—যেমন, কর আদায়ের রেকর্ড, বৈবাহিক বা রোজগারের স্থিতি জানার প্রয়োজনে। গণতান্ত্রিক প্রয়োজন মেটাতে নথিভুক্তি আবশ্যক করা উচিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারীদের দিয়ে তা রেজিস্টারে লেখা উচিত নির্বাচনের ঠিক আগে এবং অন্যান্য সরকারি রেকর্ড থেকে তা আলাদা করে রাখা উচিত।

23. ভোটদান কি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত?

ভোটদান বাধ্যতামূলক করার (যেমন অস্ট্রেলিয়ায়) যুক্তি এই যে সরকারের নিযুক্তি ও প্রতিনিধি নির্বাচন শুধু অধিকার নয়, কর্তব্য—আমাদের পূর্বসূরীরা এর জন্যে অনেক সংগ্রাম করেছেন। প্রতিটি অনুপস্থিতি ভোট পত্রে রেকর্ড করা উচিত—যেমন উদাসীন, অনুপস্থিত বা মৃতদের সূচী তৈরি কবা। এমন যেন না হয় তাদের অনুপস্থিতির কোন খোঁজ রাখা হল না। এর বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে 'মুক্ত নির্বাচন'-কে বাধ্যতামুলক করা অসঙ্গত, যেমন অসঙ্গত 'অধিকার' দিয়ে জোর করে তার প্রয়োগ করানো। আরও বলা হয়, অনুপস্থিত ভোটারদের দলগত বা গোষ্ঠীগত সংখ্যা নিরুপণ করলে ধরা পড়বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার খামতি কোথায়। অনুপস্থিতি তাই সংকেতের কাজ করে এবং দোষ শোধরাতে সাহায্য করে।

বাধ্যতামূলক নথিভুক্তি

অধিকাংশ গণতন্ত্র দ্বিতীয় যুক্তি মেনে চলে এবং নথিভুক্ত ঐচ্ছিক মনে করে। আবার অনেকে উল্টোটাও করে। তাহলে কি বাধাতামূলক নথিভুক্তি এই যুক্তির পরিপন্থী? তা নাও হতে পারে। ভোট দেবে কি দেবে না সে বিচার নিজস্ব, কিন্তু ভোটদানে অধিকারীর নাম অবশ্যই তালিকায় থাকা দরকার। কারণ তালিকার প্রয়োজন নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে চালাতে। প্রতিটি নির্বাচন-কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা নির্ণয় করার উপর নির্বাচনের সঠিক ফলাফল ঘোষণা নির্ভর করে।

24. ভোট গোপন রাখার কি দরকার?

ইংরেজ উদারপন্থী দার্শনিক জে. এস. মিলের বিশ্বাস ছিল যে ভোট খোলাখুলি দেওয়া উচিত কারণ ভোট দেওয়া হয় ব্যক্তিস্বার্থে নয়, সমগ্রের স্বার্থে এবং প্রকাশ্য ভোট হলে সবাই তা জানতে পারে। পরেও অনেক চিন্তাবিদ এই আদর্শের সমর্থন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মতদাতারা মালিক, জমিদার, যাজক বা অন্যান্য শক্তিশালী ব্যক্তির চাপের শিকার হয়; বিশেষ করে প্রার্থীরা তাদের ঘুষ দিয়ে কিনে ফেলে। তাই সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই আজ গোপন ব্যালট আবশ্যক বলে মানা হয়।

25. প্রার্থী হওয়ার অধিকারী কে?

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে ভোট দেওয়ার যোগ্য সেই প্রার্থী হওয়ার যোগ্য। কিছু দেশে প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স ভোটারের বয়সের থেকে বেশি রাখা হয়।[1] ব্যাপারটা অপ্রয়োজনীয়, কারণ সবাই জানে যে সামাজিক কাজের কিছু অভিজ্ঞতা না থাকলে মানুষ সেই প্রার্থীকে যোগ্য মনে করে না।

মনোনয়নের শর্ত

কোন প্রার্থীর নাম মনোনয়ন বা নথিভুক্ত করার ব্যাপারটা আলাদা। বেশিরভাগ নির্বাচন-ব্যবস্থায় বাজে-প্রার্থী দাঁড় করানো আটকাতে কিছু শর্ত রাখা হয়—যেমন, প্রার্থীর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নথিভুক্ত ভোটারদের ন্যূনতম স্বীকৃতি কিম্বা কিছু টাকা জামানত রাখা যা নির্ধারিত ভোটের কম পেলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।[2] এই দুই ক্ষেত্রেই বিপদ হল এতে 'বাজে', ও 'যোগ্য' দুই শ্রেণীর প্রার্থীকেই আটকানো যেতে পারে—বিশেষ করে যেখানে প্রার্থী নতুন কোন দল বা গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব দিতে চায়। কিছু দেশে আবার কেবলমাত্র নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরাই দাঁড়াতে পারে। এখানেও কারণটা একই—'বাজে' প্রার্থীদের আটকানো। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিপদ হল এতে করে দলের বা প্রার্থীর উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারে এবং ভোটারদের মতামত প্রকাশের সংবিধানিক অধিকার খর্ব হতে পারে।

প্রাথমিক নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলের প্রার্থীদের এক প্রাথমিক নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়। এই নির্বাচনে দলের নিজস্ব নথিভুক্ত ভোটাররা অনুমোদন দেয়। যদিও এই ব্যবস্থায় প্রার্থীদের প্রাথমিক মনোনয়নে ভোটারদের মতামত জানা যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। যারা ধনী বা যাদের পিছনে পয়সাওয়ালা লোকেদের মদত আছে তারা ছাড়া কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে না। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রার্থীর মনোনয়ন হয় নির্বাচন কেন্দ্রের দলীয় সদস্যদের গোপন ভোট দ্বারা। এই প্রথাও সর্বজনীন নয়।

---

1 ভারতীয় নাগরিকেরা ভোটদানের অধিকার পান আঠেরো বছরে। লোকসভা কিংবা বিধানসভার প্রার্থী হতে গেলে অন্তত পঁচিশ বছর বয়স হতে হয়। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা বা বিধানপরিষদের সদস্য কিংবা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স পঁয়ত্রিস বছর।—পৃ: 40

2 এই ব্যবস্থা ভারতে প্রযোজ্য নয়। প্রদত্ত ভোটের অন্তত 10 শতাংশ না পেলে প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।—পৃ: 41

26. সরকারি পদে এত কম মহিলা নির্বাচিত হন কেন?

পশ্চিমের গণতন্ত্রে মহিলা ভোটারদের তুলনায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যন্ত কম।[1] পুরনো গণতন্ত্রগুলিতে সরকারি পদে মহিলাদের অংশগ্রহণের গড়পড়তা হার হল 15 শতাংশ তার মধ্যে উত্তর য়ুরোপের নর্ডিক দেশগুলিতে এই হার বেশি অর্থাৎ 35 শতাংশ, ফ্রান্সের 6 শতাংশ এবং বাদবাকি সব দেশে 10 শতাংশ। এর কারণ কিছুটা ঐতিহাসিক কিছুটা অভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক। পৃথিবীর ইতিহাসে বেশির ভাগ সময়ে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত মনে করা হয়েছে এবং তাই তাঁদের এ কাজের বাইরে রাখা হয়েছে। এই প্রচলিত বিশ্বাসকে পারিবারিক শ্রম বিভাজন প্রথা আরও মজবুত করেছে। এই বিশ্বাসের ফলে মেয়েদের বাড়ির কাজ এবং শিশু পালনের দায়িত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয় আর তাই রাজনৈতিক কাজে অংশ নেওয়া তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। রাজনীতির কাজ সময়সাপেক্ষ : সরকার ও সংসদের কাছে যে সময় ব্যয় হয় তাতে একজন মানুষ অ-সামাজিক হতে বাধ্য। তাছাড়া রাজনীতিতে যে প্রতিযোগিতা, দলে দলে রেষারেষি আর আত্মম্ভরিতার পরিবেশ তা মেয়েরা সবসময় পুরুষের মত মানিয়ে নিতে পারেন না।

সমতার প্রয়োজন

সমতা কি প্রয়োজন? নির্বাচিত অথবা অনির্বাচিত সরকারি পদে নিয়োগের সুযোগ যখন সমাজের কোনও একটি শ্রেণী বিশেষভাবে ভোগ করে তখনই রাজনৈতিক সমতার গুরুত্ব বোঝা যায়। এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মেয়েদের সমস্যাগুলি পুরুষেরা তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে না। যদিও মহিলাদের মধ্যেও মতের ও স্বার্থের ভেদ আছে তবুও একথা ঠিক যে পুরুষ প্রধান সংসদ যখন গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, ধর্ষণ বা এই জাতীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে তখন তা মহিলাদের কাছে অপমান জনক মনে হওয়া অযৌক্তিক নয়। যাই হোক, মহিলাদের বিশিষ্ট ভাবনাচিন্তা ও গুণগত উৎকর্ষ যদি জনজীবনে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে তাতে বৃহত্তর সমাজেরই ক্ষতি।

ভারসাম্যের পরিবর্তন

এখন কি করণীয়? রাজনৈতিক অসাম্যের এই অযৌক্তিক উত্তরাধিকার নস্যাৎ করতে বিভিন্ন স্তরে নানা উপায় অবলম্বন করতে হবে—স্কুল এবং জনশিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনোভাব করতে হবে পরিবর্তন, শিশু পালনের সুবিধা গড়ে তুলতে হবে। সংসদের

1 গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে। রাজ্যস্তরে ও কেন্দ্রীয় আইনসভায়ও এই ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা চলছে।—পৃ: 45

কর্মসূচী ও সুযোগ সুবিধায় পরিবর্তন আনতে হবে এছাড়াও করতে হবে আরো অনেক কিছু। এই ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ দায়িত্ব আছে—মেয়েদের উৎসাহ বাড়ানোর কাজে তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে—নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে তা সে কোটা ঠিক করে হোক বা সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রের মাধ্যমে কিম্বা অন্য যে কোন উপায়ে হোক। নর্ডিক দেশগুলিতে এভাবেই সাফল্য এসেছে।

27. সংসদীয় প্রতিনিধিরা কি অর্থে ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করে?

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দুটি প্রধান অর্থ করা যায়। একটি হল; মাধ্যম বা 'এজেন্সি'-র ধারণা। অর্থাৎ প্রতিনিধিকে ভোটাররাই 'অনুমোদন' করছে, প্রতিনিধি 'ভোটারদের হয়ে' 'তাদেরই জন্য' কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিনিধি তার কেন্দ্রের সবার হয়ে কাজ করে যেমন স্থানীয় স্বার্থ তুলে ধরা, স্থানীয় জনমতকে একসূত্রে বাঁধা. ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি মেটানোর চেষ্টা করা ইত্যাদি। আবার অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রতিনিধি শুধু তাদেরই স্বার্থ দেখে যারা তাকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছে যেমন যে সব নীতি বা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সে জিতেছে শুধু সেগুলিই সে রূপায়িত করে। এই সব কর্মসূচী কোন কেন্দ্রের কিছু ভোটার যেমন অনুমোদন করেছে তেমনই কিছু ভোটার আবার খারিজও করেছে। তবে সংসদীয় প্রতিনিধিকে যে তার কেন্দ্রের সমস্ত ভোটারের হয়ে সব বিষয়ে কথা বলতে হবে তা নয়। এই ধারণা মানলে যে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রতিনিধিকে নির্বাচন করা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করা অসম্ভব। অথচ ওই নির্দিষ্ট কর্মসূচীর জন্যই প্রতিনিধি ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

অণু বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব

বাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দ্বিতীয় ধারণা হল এই যে তা হবে অণু বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বের বদলে সামগ্রিক প্রতিনিধিত্ব। কোন আইন সভা তখনই যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে যখন সেখানে বৃহত্তর নির্বাচক মণ্ডলীর সার্বিক স্বার্থের যেমন তার সামাজিক গঠন, ভৌগোলিক বিস্তার. দলীয় মতের সমর্থন ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে। এর মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? সবকটাই। কিন্তু যেখানে আইন তৈরির প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচী নিয়ে হাজির হওয়া জাতীয় স্তরের দলগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে সেখানে আইন সভার গঠনে সংশ্লিষ্ট দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত প্রতিফলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা ন্যায্য দাবি মেটাতে সক্ষম (প্রশ্ন 28)।

দুটি গণতান্ত্রিক তত্ত্ব

মাধ্যম বা 'এজেন্ট' এবং অণুবিশ্ব—প্রতিনিধিত্বের এই দুই তত্ত্বের মধ্যে দুটি গণতান্ত্রিক

ধারণা নিহিত (প্রশ্ন 1)। জন সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব অনুসারে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস মানুষ আর তাই সরকার এবং সংসদ কাজ করবে গণ-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে। প্রতিনিধি ভোটদাতার প্রতিভূ বা এজেন্ট। ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের হয়ে, তাদের জন্য কাজ করে। ভোটারদের কাছে প্রতিনিধি জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং ভোটাররাই তাকে অপসারণ করতে পারে। অণুবিশ্বের তত্ত্বে পাওয়া যাবে রাজনৈতিক সাম্যের ধারণা। এই ধারণা অনুসারে মানুষ যেখানেই থাকুক কিম্বা যাকেই ভোট দিক প্রতিটি ভোটের মূল্য হবে সমান। আইন সভাকে হতে হবে সমগ্র নির্বাচক মণ্ডলীর প্রতিনিধি—সেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর ভৌগোলিক চরিত্রের ও বিভিন্ন দলের পাওয়া ভোটের পরিমাণগত প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

28. বিভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে তফাত কোথায়?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের নির্বাচনী প্রথা চালু আছে। এখানে মাত্র পাঁচটি প্রথা সম্পর্কে বলা হবে। প্রথাগুলির তুলনামূলক গুণাগুণ বিচার করা হবে পরে।

বহুত্ব প্রণালী

বহুত্ব অথবা 'যে আগে বুড়ি ছুঁতে পারে' সেই প্রণালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে, ব্রিটেনে এবং অনেক সাবেক উপনিবেশে আইনসভার নির্বাচনে প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় গোটা দেশকে প্রায় সমান আকারবিশিষ্ট একক সদস্যের নির্বাচন কেন্দ্রে ভাগ করা হয়। ভোটাররা ব্যালটপত্রে কেবল যে কোন একজন প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারেন। যে প্রার্থী সবথেকে বেশিসংখ্যক ভোট পান তাঁকেই বিজয়ী ঘোষণা করা, তা তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পান বা না পান।

বিকল্প ভোট

অস্ট্রেলিয়ায় আইনসভার নিম্নকক্ষে বিকল্প ভোট ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একই নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটার তার পছন্দমত একাধিক প্রার্থীকে ক্রমানুসারে অনুমোদন করতে পারে। প্রথম পছন্দের ভোটে যদি কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তা হলে সবথেকে কম ভোট পাওয়া প্রার্থীকে নাকচ করে দ্বিতীয় পছন্দের ভিত্তিতে ব্যালটগুলি পুনর্বণ্টন করা হয়। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না কোন প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে। এ ছাড়া প্রথম দফার ভোটে যে দুজন প্রার্থী সবথেকে বেশি ভোট পাবে তাদের মধ্যে দ্বিতীয় দফার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণ করা যায় (যেমন ফ্রান্সে করা হয়)।

আইন ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা অ-গণতান্ত্রিক।

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট

আয়ারল্যাণ্ড, মালটা এবং অস্ট্রেলিয়ার সিনেটে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপ্রথা প্রচলিত। এই প্রণালীতে একই নির্বাচনক্ষেত্র থেকে একাধিক প্রার্থী মনোনীত হয়—সাধারণত জনসংখ্যার ঘনত্ব বুঝে তিন থেকে সাত জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়। যতজন প্রতিনিধির দরকার, ভোটার ততগুলি ভোট পায় এবং ক্রমনির্দেশে তাদের পছন্দ জানায়। জেতার জন্য প্রার্থীকে নির্ধারিত 'কোটা' পেতে হবে কিংবা যত ভোট পড়েছে সেই অনুপাতে নির্ধারিত সংখ্যার ভোট তাকে পেতে হবে। যারা প্রথম গণনার ভিত্তিতে কোটা ছুঁতে পারবে না তারা নির্ধারিত কোন ভাগ-বাঁটোয়ারার ফর্মুলার ভিত্তিতে দ্বিতীয় বা পরের পছন্দের ভোটগুলো পাবে।

দলগত তালিকা

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে এবং ইজরায়েলে দলগত তালিকা-প্রণালী প্রচলিত। দলগুলি তাদের প্রার্থী তালিকা আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে তৈরি করে পর্যায় ক্রমে। ভোটার অনুমোদন করে তার পছন্দের দলকে। একটি দল মোট যত ভোট পায়, সেই অনুপাতে তাদের প্রার্থী নির্বাচিত হয়। এমনও হতে পারে যে জেতার জন্য কোনও দলকে আনুপাতিক ন্যূনতম ভোট পেতে হবে।

মিশ্র-সদস্য প্রণালী

মিশ্র-সদস্য বা অতিরিক্ত-সদস্য প্রথার প্রচলন রয়েছে জার্মানি ও হাঙ্গেরিতে। নিউজিল্যাণ্ডেও এই প্রথা চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রণালীতে অন্তত 50 শতাংশ প্রতিনিধি একক সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রে নির্বাচিত হন। বাকিরা নির্বাচিত হন দলগত তালিকার ভিত্তিতে। তা সে স্থানীয় বা জাতীয় যে কোন স্তরেই হোক না কেন। খেয়াল রাখা হয় যাতে নির্বাচনের ফলাফল দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে হয়। ভোটদাতাদের দু'টি করে ভোট থাকে—একটি প্রার্থীর পক্ষে অন্যটি দলের পক্ষে। এখানেও জিততে হলে দলকে ন্যূনতম সংখ্যার ভোট পেতে হয়।

29. এই প্রণালীগুলির সুবিধা বা অসুবিধা কি, কি?

কোন দেশের জন বৈচিত্র্য, সেখানকার মানুষ কে কোন দলকে পছন্দ করে এই সব না বুঝে নির্বাচন প্রণালীর দোষগুণ সরাসরি বিচার করা যায় না। যেমন কোন দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল না থাকে তাহলে আনুপাতিক প্রণালীর কোন মানেই হয় না কারণ সে ক্ষেত্রে অনুপাত দেখা হয় দলের জনসমর্থনের ভিত্তিতে। তাই বিভিন্ন প্রণালীর মূল্য বিচার করতে গেলে তা করতে হবে সাধারণভাবে, কোন বিশেষ ফলাফলের ভিত্তিতে নয়।

সরলতা

বহুত্ব প্রণালীর সুবিধা তার সরলতায়। অন্যান্য প্রণালীর তুলনায় এই প্রণালীর সাহায্যে সংসদে এককদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া যায় এবং বহু মতের ভিত্তিতে কোন এক দলের সরকার গঠন করা যায়। এতে সরকার পরিবর্তনের দরকার হলে জনমতের সামান্য তারতম্যই যথেষ্ট। যদিও এই পরিবর্তন নির্ভর করে প্রান্তিক নির্বাচন কেন্দ্রগুলির সংখ্যার উপর। এই প্রণালীর অসুবিধা এই যে ফলাফল ভীষণ রকম অসম অনুপাতের হতে পারে—যদিও তা নির্ভর করে দল ও নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যে জাতীয় ভোট বন্টনের উপর। মনে করা যাক প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে চারটি দলের জন সমর্থনের হার যথাক্রমে 40, 30, 20 ও 10। সে ক্ষেত্রে যে দল 40 শতাংশ ভোট পাবে তারাই সংসদের বেশির ভাগ আসন জিতে নেবে—অর্থাৎ 60 শতাংশ লোকের প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হবে না। বাস্তবে অবশ্য এইভাবে কাজ হয় না। এই প্রণালীতে সুবিধা যেই দলগুলি পায় যাদের সমর্থন ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে বিশেষ বিশেষ এলাকায় একসঙ্গে থাকে এবং সে ক্ষেত্রে সুবিধামত নির্বাচন কেন্দ্রের সীমারেখা টানার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এই প্রথায় ভোটাররা অনেক বেশি কৌশলের সঙ্গে ভোট দেন। কেউ জানে না অন্যজন কাকে ভোট দিচ্ছে। অনেকেই হয়ত প্রথম পছন্দের প্রার্থীকে না বেছে অন্য কাউকে ভোটটি দেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন

বিকল্প ভোটের সুবিধা এই যে প্রার্থীকে জিততে গেলে তার নির্বাচন কেন্দ্রের বেশিরভাগ ভোটারের সমর্থন পেতে হবে। বহুত্ব প্রণালীতে যা সম্ভব নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে জেতার অর্থ নির্বাচন কেন্দ্রের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি হওয়া সম্ভব। তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে সংসদে তৃতীয় ও চতুর্থ দলের প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনা থাকে না যদি তাদের জনসমর্থন পুরো দেশে সমান ভাবে ছড়িয়ে থাকে।

ভোটারদের পছন্দ

একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটের সাহায্যে ছোট ছোট দলও প্রতিনিধিত্ব পেতে পারে। যদিও নির্বাচন কেন্দ্রের বিস্তারের উপর আনুপাতিক হার নির্ভর করে (নির্বাচন কেন্দ্র যত বড় হবে আনুপাতিক হিসাব ততই ভাল হবে)। বিশেষ দলের সমর্থকরাও তাদের প্রার্থীদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে পারবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে নির্বাচন কেন্দ্র বিশাল হলে ভোটার ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়। তাছাড়া, নীচের দিকের পছন্দ বাছাই করে প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারটা ভীষণ ঝামেলার।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

দলগত তালিকা-প্রণালীই একমাত্র প্রণালী যাতে প্রতিটি ভোট সমান মর্যাদা পায় এবং তাই ভোটের অনুপাতে প্রতিটি দলকে যথাযথ আসন পেতে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থার অসুবিধে হল, পুরো নির্বাচন-কেন্দ্রের সরাসরি দায়িত্ব কোন প্রতিনিধির উপর বর্তায় না এবং ভোটার (বা দলীয় সদস্য) তার দলের পছন্দসই প্রতিনিধিদের কোন ক্রম-পর্যায় নির্ধারণ করতে পারে না। প্রতিনিধি পছন্দের ব্যাপারটা তাই ভোটারদের থেকে দলের কেন্দ্রীয় সংগঠনের পছন্দের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তবুও বলতে হয়, তালিকা-প্রণালীতে বিভিন্ন দল সামঞ্জস্য রেখে প্রার্থী মনোনয়নের সুযোগ পায়—সামঞ্জস্য রাখতে হয় অন্যান্য দলের সঙ্গে এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গেও।

পার্থক্যমূলক প্রতিনিধিত্ব

মিশ্র-সদস্য প্রণালীতে একক-নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্যেও যথাযোগ্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সম্ভব। এখানে বিশেষ দল বিশেষ সমর্থন পেলে তবেই এক-দলীয় সরকার গঠন করতে পারবে, না হলে জনসমর্থনের অনুপাতে সম্মিলিত সরকার গড়তে হবে। এই অসুবিধে ছাড়াও, এক্ষেত্রে দুই ধরণের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন হয়ে পড়ে—এক, নির্বাচন-কেন্দ্রের ভিত্তিতে; অপরটি, নির্বাচন-কেন্দ্র ছাড়াই। এই প্রণালীর সমর্থকরা বলে যে এই অসুবিধাগুলি দুর করা যায় যদি—এক, নির্বাচন কেন্দ্রে হেরে যাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সদস্যদের নিয়ে যদি দলগত-তালিকা তৈরি হয়; এবং দুই, এই সদস্যদের উপর নির্বাচন-কেন্দ্র দেখাশোনার ভার দেওয়া যায়।

30. সম্মিলিত সরকার কি অ-গণতান্ত্রিক ?

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সমর্থকরা মনে করেন যে বহুত্ব বা বিকল্প ভোট প্রণালী অ-গণতান্ত্রিক কারণ সেক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের ভোটের মূল্য সমান হয় না অর্থাৎ কিছু ভোটের উপর বেশি মূল্য আরোপ করা হয়। কাজেই এতে রাজনৈতিক সমতার মৌলিক গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্ত সংখ্যালঘুদের ভোটে সরকার নিযুক্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সমালোচকরা বলেন, যেহেতু সংখ্যাগুরু ভোটে জেতা কোন দলের পক্ষে মুশকিল, তাই এই প্রথায় সম্মিলিত সরকার গড়ার প্রয়োজন বার বার দেখা দেয়। এবং সম্মিলিত সরকারের উপর গণনিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহি করার প্রয়োজন কমে যাওয়ায় দলীয় নেতৃত্বের অধিকার বেড়ে যায়। তাতে, বাম ও দক্ষিণ পন্থীদের মধ্যবর্তী ছোট ছোট দলগুলির ক্ষমতা অহেতুক বেড়ে যায়। তবে এই সমালোচনার বিরুদ্ধে এ কথাও বলা যায় যে সম্মিলিত সরকার গঠনের ভাগীদার ছোট-বড় প্রতিটি দল। তাদের প্রত্যেককে ভোটারের সমর্থনের

জন্যে আবার ফিরে যেতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ছোট দলগুলিও জনমতের চাপ উড়িয়ে দিতে পারে না।

বিশেষ পরিস্থিতি

দুই পক্ষের যুক্তি বিচার করে বলা যায় যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা নির্ভর করে দেশবিশেষের পরিস্থিতির উপর। ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যেমন বহুত্ব প্রণালীর দোষ ধরা পড়েছে, ঠিক তেমনি ইতালিতে ধরা পড়ে নিছক আনুপাতিক প্রথার দোষ। সাধারণভাবে বলা যায় যে নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব এবং আনুপাতিক তত্ত্বের গুণের সমন্বয় ঘটাতে পারলে সবচেয়ে ভাল। অবশ্য এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় নির্ভর করে দেশবিশেষের দল ও সংবিধানিক উৎকর্ষের উপর।

31. স্বচ্ছ বা নির্দোষ নির্বাচন প্রণালীর নিশ্চয়তা কোথায়?

স্বচ্ছ নির্বাচন প্রণালীর প্রধান প্রতিবন্ধক তিনটি। প্রথমত, ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিবন্ধক সম্পূর্ণ অপসারণ সম্ভব নয়, তবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রধান একটি উপায় হল, সমস্ত রাজনৈতিক দলের অনুমোদনে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নিযুক্ত করে তাদের হাতে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া। নির্বাচন-কেন্দ্রের সীমা নির্ধারণ ভোটার নথিভুক্তি, প্রচার ও নির্বাচনের কাজ এবং ভোট গোনা—এ সমস্ত করবে এই কমিশন। স্বাধীন প্রচার-মাধ্যমের অভাবে এই কমিশনকে দেখতে হবে যে প্রতিটি দল যেন সরকারি প্রচার মাধ্যমের সমান সুযোগ পায়। এও দেখতে হবে যে দলীয় সংগঠন আর সরকারি সংগঠন যেন বিধিবদ্ধভাবে আলাদা করা হয় এবং নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন যেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব মন্ত্রীদের এক্তিয়ারে না থাকে।

নির্বাচনী দুষ্কর্ম

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক নির্বাচনী দুষ্কর্ম। নির্বাচনের সময় দলীয় সদস্য বা তাদের সমর্থকরা ঘুস, ভয় দেখানো, নাম-ভাঁড়ানো, প্রতারণা, দুবার ভোট দেওয়া ইত্যাদি নানারকমের দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ে। এসব বন্ধ করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশ বা নির্বাচনী অফিসার নিযুক্ত করে প্রার্থীদের সুরক্ষা প্রদান করার দরকার এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে নৈতিকতা দেওয়া দরকার। নির্বাচনী অফিসারদের যোগ্যতা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। তাদের নিযুক্তি ও প্রশিক্ষণের পুরো দায়িত্ব জাতীয় নির্বাচন কমিশনের হওয়া উচিত। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের বিশেষ সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনেই আন্তর্জাতিক

স্বাধীনতা ও বৈধতার পক্ষে বিপজ্জনক—ঘুস দেওয়া, ভয় দেখানো, নাম ভাঁড়ানো।

পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি নিয়মিত করা উচিত। এতে সুস্থ নির্বাচনের পক্ষে বহিরাগত চাপের সৃষ্টি হয়।

আর্থিক প্রভাব

সুস্থ নির্বাচনের তৃতীয় প্রধান শত্রু অর্থ। আর্থিক সম্পন্নতা বা সম্পন্ন লোকের সান্নিধ্য কিছু প্রার্থী বা দলের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেয়। অর্থের প্রভাব কমাবার প্রধান উপায় হল প্রার্থী এবং দলের খরচ করার অধিকার শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা—তা সে রাষ্ট্রীয় স্তরেই হোক বা স্থানীয় স্তরে। সেই সঙ্গে সরকারি প্রচার মাধ্যম সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত। এই দুই কাজেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

অভিমত ভোট

নির্বাচনের আগে জনমত যাচাই বা অভিমত ভোট অনেক দেশেই আজ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। কোথাও কোথাও নির্বাচনের সময় বা পুরোদমে প্রচার চলাকালীন মতামত সংগ্রহ আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মনে করা হয় যে এইসব মতামত ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে যে কে জিতবে বা না জিতবে তাতেই লোকের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে পড়বে। তাতে নির্বাচনের মূল বিষয়গুলি চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং ফলাফলের উপর প্রভাব পড়বে। অবশ্য বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞের ধারণা যে ভোটের উপর এইসব জনমতের কোন প্রভাব পড়ে না। বিশেষ করে আজকের দিনে যখন আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের দাপট বেড়ে চলেছে সেক্ষেত্রে বাস্তবে জনমত দমনের ব্যাপার কতটা সম্ভব সেটাও বিচার্য।

32. রাজনৈতিক দলগুলি কি সরকারি অনুদানে চলবে?

রাজনৈতিক দলগুলির সরকারি অনুদান পাওয়ার সবথেকে বড় যুক্তি হল যে দলগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ভূমিকার স্বীকৃতি আর্থিক সাহায্য। সরকারি অনুদানের ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাশালী কায়েমি স্বার্থের প্রভাব কমবে। প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে কোন দল ভোট পাচ্ছে সেই অনুপাতে তাদের সরকারি সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন দল যদি সমাজের বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রচার চালায় বা নির্বাচনী দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে তাহলে সেই দলকে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে না।

দলীয় স্বশাসন

রাজনৈতিক দলকে সরকারি অনুদান দেওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি হল দলগুলি ততক্ষণই

জনমতকে যথার্থ ভাবে তুলে ধরতে পারবে যতক্ষণ তারা রাষ্ট্রের প্রভাব থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম। দলের এই স্বাতন্ত্র বা স্বশাসনের আবশ্যিক শর্ত হল চাঁদার সাহায্যে তহবিল গড়ে তোলা। যে দল নিজের কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না তারা গণতান্ত্রিক সরকার চালানোর উপযুক্ত নয়। একটা নির্দিষ্ট সীমার উপরে যা চাঁদা জমা পড়বে তার হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক করে কায়েমি স্বার্থের প্রভাব আটকানো যায়। সেইসঙ্গে যে সব সংস্থা অর্থ সাহায্য করবে তাদের উচিত সদস্য বা শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি নিয়ে তবেই চাঁদা দেওয়া।

সীমিত সরকারি অনুদান

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে অর্থ সংগ্রহের উপরেই দলের তহবিল গড়ে ওঠে। তার মানে এই নয় যে সীমিত সরকারি অনুদান দেওয়া যাবে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত অনুদান ন্যায্য যেমন, দলীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ বা নির্বাচনের সময় বিনামূল্যে সরকারি প্রচার মাধ্যমের সুযোগ। এই সাহায্যের প্রয়োজন বিশেষ করে সেইসব দেশে যেখানে গণতন্ত্র একবারে নতুন। পরিবর্তনের সময় গণতান্ত্রিক দলগুলিকে একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করতে হয় এবং নির্বাচনী প্রতিযোগিতার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না।

33. নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে কি প্রতিনিধিদের দল বদলের সুযোগ দেওয়া উচিত?

না। কোন দলের হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অর্থ নির্ধারিত সময়ের জন্য দলের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। তা না হলে, রাজনৈতিক কর্মসূচী ও পন্থা যাচাই করে ভোট দেওয়ার ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে নির্বাচন-কেন্দ্রের ভিত্তিতে ভোট হয় সেখানে দলবদল করলে প্রার্থীর উচিত ইস্তফা দিয়ে উপ-নির্বাচনে পুনর্বার প্রার্থী হওয়া। আর 'লিষ্ট' বা তালিকা প্রথায় প্রার্থীকে সোজাসুজি ইস্তফা দিতে হবে[1] এবং তার জায়গায় দলের সূচী অনুযায়ী পরবর্তী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

34. নির্বাচনে অন্তর্বর্তী সময়ে ভোটারদের কোন ক্ষমতা থাকে কি?

এটা ভাবা ভুল যে ভোটাররা মাত্র চার কি পাঁচ বছরে একবার করে ভোট দিতে পারে বলে দুটি নির্বাচনের অন্তর্বর্তী সময়ে তারা শক্তিহীন। ভবিষ্যতে ভোটারদের মুখোমুখি

---

1 ভারতে কোন রাজনৈতিক দলের এক-তৃতীয়াংশের কম নির্বাচিত সদস্য দল পাল্টালে দলত্যাগ আইনের আওতায় তারা সংশ্লিষ্ট আইনসভার আসন হারাবে। তবে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্য যদি দল পাল্টাতে চায় তা হলে তারা নতুন দল গড়তে পারে অথবা অন্য দলে যোগ দিতে পারে।—পৃ: 57

হতে হবে এই ভাবনা ক্ষমতাসীন দলকে সংযত রাখে এবং তাই প্রতিনিয়ত তারা জনমতের কথা খেয়াল রাখতে বাধ্য হয়। বলা যায়, নির্বাচনের জুজু সবসময়েই তাদের সামনে। কেন্দ্র ভিত্তিক নির্বাচন-প্রণালীতে এর প্রভাব অনেক বেশি স্পষ্ট। দেখা গেছে, ক্ষমতাসীন দল কোন উপ-নির্বাচনে হেরে গেলে তাদের নীতিতে, এমনকি নেতৃত্বে, নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। তা ছাড়া, অন্যান্য অনেক উপায়ে ভোটাররা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন সংগঠিত সংস্থার সদস্য হয়ে, প্রচার-অভিযান চালিয়ে, প্রতিনিধি বা ক্ষমতাসীন সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা মিছিলে ভাগ নিয়ে। তাছাড়া প্রচার-মাধ্যম তো আছেই জনমতকে সংগঠিক করে নিয়মিত প্রচার করবার জন্য।

35. গণতন্ত্রে কখন 'জনমত-সংগ্রহ' করা উচিত?

বেশির ভাগ গণতন্ত্রেই 'জনমত-সংগ্রহের' প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মামুলি সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেই হোক বা অন্য যে কোন ভাবেই হোক, এই প্রয়োজন দেখা দেয় এমন কোন আইনের পরিবর্তন দরকার মনে করলে যার সংবিধানিক তাৎপর্য ব্যাপক।[1] তার কারণ এই যে সংবিধান জনগণের, সাংসদের বা সরকারের নয়। কাজেই সংবিধানের পরিবর্তন করতে গেলে মানুষের প্রত্যক্ষ অনুমোদন দরকার।

অন্যত্র আইন প্রণয়নে 'জনমত-সংগ্রহ'

নীতিগত ক্ষেত্রে বা অন্যান্য বিষয়ে আইন-প্রণয়নকালে 'জনমত-সংগ্রহের' ব্যাপারটা বিবাদ-সাপেক্ষ। দরকারি বিষয়ে বা নীতি নির্ধারণে মানুষের সোজাসুজি রায় দেওয়ার অধিকার থাকলে গণতন্ত্র মজবুত হয়—বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে কোন জরুরী বিষয় চেপে দেবার চেষ্টা হচ্ছে বা দলীয় নির্বাচনী ঘোষণা-পত্রের ঘোষিত তালিকার অন্ধকারে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। এর বিরুদ্ধে বলা হয়, যেহেতু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পিছনে অনেক বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে (যেমন, কর-সম্বন্ধীয় বিষয় ও সরকারি খরচ), তাই কোন একটি বিষয়কে আলাদা করে জনগোষ্ঠীর হাতে বিচার ভার দিলে তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে যাদের হাতে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। এমন করলে বস্তুত প্রতিনিধিত্ব-প্রণালীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং তাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব না বাড়িয়ে বরং তাদের দায়িত্বহীন করে তোলা হয়।

---

1 সংসদের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন পাওয়া গেলে তবেই ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করা যায়।—পৃ: 57

কোন নিশ্চিত উত্তর নেই

এটি এমনই একটি বিষয় যার সম্পর্কে ঠিক বা বেঠিক কোন স্থায়ী মতামত দেওয়া যায় না। নিজস্ব রাজনৈতিক ঐতিহ্য অনুসারে প্রত্যেক গণতন্ত্রকে এ ব্যাপারে নিজস্ব পন্থা বেছে নিতে হবে।

3

উন্মুক্ত ও দায়বদ্ধ সরকার

36. গণতন্ত্রে উন্মুক্ত সরকারের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গণতন্ত্রে স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত সরকারের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সরকারের কাজকর্ম ও তার নীতির ফলাফল সম্বন্ধে নাগরিকেরা সঠিক তথ্য না পেলে নির্বাচনের সময় তাদের পছন্দ-অপছন্দ জানাতে তো পারবেই না, সেই সঙ্গে সরকারকে জবাবদিহিতে বাধ্যও করতে পারবে না। তথ্য জানা নাগরিক অধিকার। এই অধিকার সরকারের দায়-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না। প্রচার মাধ্যম জনতার হয়ে তথ্য জানাতে সাহায্য করবে। জনতার টাকাতেই সরকার চলে, কাজেই মানুষের অধিকার আছে তাদের বকলমে এবং তাদের টাকায় কি কাজ হচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার। এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, এই তথ্য সরবরাহ করা মানে সরকারের টাকা অপচয় করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে সরকারি কাজে দক্ষতা বাড়াতে, সরকারি টাকার অপচয় রুখতে, উৎকোচ বা ঘুস বন্ধ করতে এবং ত্রুটিপূর্ণ নীতি সনাক্ত করতে উন্মুক্ত সরকারের প্রয়োজন আছে। তা না হলে ত্রুটিগুলি রোগে পরিণত হবে। নাগরিক স্বাতন্ত্র্যের স্বার্থে এর প্রয়োজন আছে। সরকার বা তার অধীনস্ত সংস্থাগুলি নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে তা জানা প্রতিটি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উন্মুক্ত সরকারের কয়েকটি দিক

উন্মুক্ত সরকারের চারটি প্রধান লক্ষণ : এক, সরকার তার নীতি সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক খবরাখবর সরবরাহ করবে। তাকে জানাতে হবে তথ্যের ভিত্তি, বাস্তবে এই নীতি কিভাবে কার্যকর করা হচ্ছে এবং তার ফলাফল কি, খরচ কত পড়েছে, কোন নিয়মে সরকার এই নীতি কার্যকর করছে ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হল : সরকারি নথিপত্র সরাসরি এবং সংসদের মাধ্যমেও প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও জনসাধারণের দেখতে পাওয়ার সুযোগ। এরমধ্যে পড়বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তাঁর নামে ব্যক্তিগত ফাইলটি দেখতে পাওয়ার সুযোগও। তৃতীয়তঃ, সংসদ ও বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি থেকে শুরু করে সরকারি অর্থে পরিচালিত যাবতীয় সংস্থার বৈঠকে কি আলোচনা হচ্ছে তা

প্রচারমাধ্যম ও জনসাধারণের জানার সুযোগ। চতুর্থতঃ, নীতি নির্ধারণ ও তা রূপায়ণের বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা ও সেই আলোচনার ফল প্রকাশ করা।

বৈধ ব্যতিক্রম

উন্মুক্ত সরকারের নীতির কি কোনও ব্যতিক্রম রয়েছে? গণতন্ত্রে কিছু নথিপত্র অবশ্য ন্যায়সঙ্গত ভাবেই গোপনীয় বলে মানা হয়। এর মধ্যে পড়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা; মন্ত্রীদের প্রতি আমলাদের রাজনৈতিক পরামর্শ; এমন কোনও তথ্য যা প্রকাশ পেলে জাতীয় নিরাপত্তা, গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব বা ব্যক্তি বিশেষের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে; বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গোপন তথ্য; ব্যক্তিগত ফাইল (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া)।

37. উন্মুক্ত সরকার কিভাবে পাওয়া যাবে?

বিংশ শতকের আগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেই উন্মুক্ত সরকারের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করা হত। বর্তমানে রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকা অনেক বেশি ব্যাপক ও জটিল হয়ে যাওয়ায় সংবাদপত্রের সর্বাধিক স্বাধীনতা, এমনকি সংবাদসূত্র গোপন রাখার স্বাধীনতাও যথেষ্ট নয়। আধুনিক রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হল ভুলভ্রান্তি ঢাকতে, অস্বস্তি এড়াতে অথবা আত্মম্ভরী মনোভাবের কারণে খোলামেলাভাবে কাজ না করার প্রবণতা। সরকারের এই গোপনীয়তার প্রবণতা আজকের দিনে রুখতে হবে আইন করে। উন্মুক্ত সরকার অথবা তথ্য জানার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনই হবে গোপনীয়তার চ্যালেঞ্জ।

মুক্ত তথ্য

মুক্ত তথ্যের আদর্শ আইনি কাঠামো ও ব্যবহার দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইডেনে। 36 নম্বর প্রশ্নে আলোচিত সব কটি বিষয়ই এর মধ্যে পড়ে। এগুলি হল : তথ্য জানানোর ব্যাপারে সরকারের কর্তব্য; সরকারি নথিপত্র জনসাধারণের হাতে পাওয়ার অধিকার; সরকারি সংস্থার উন্মুক্ত বৈঠক, সরকারি দফতরের বেআইনি কাজকর্ম যারা ফাঁস করবে তাদের সুরক্ষা। প্রশাসনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখার যে অধিকার সংসদ বা আইনসভার রয়েছে এগুলি তার অতিরিক্ত। এই অধিকারগুলি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনের বৈশিষ্ট্য হল : এই আইনের ব্যতিক্রমগুলি ব্যাখ্যা করবে বিচারবিভাগ, সরকার নয়।

জনসংযোগ খাতে ব্যয়

আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জনসংযোগ খাতে বিশাল বাজেট।

এর উদ্দেশ্য যে কেবল সরকারি নীতির আক্ষরিক বয়ান দেওয়া তাই নয়, সরকারের পক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টায় উপযুক্ত সময়ে তথ্যের জোগান দেওয়া। এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্য জানার অধিকার সুরক্ষিত হয়। এর জন্য সব থেকে ভাল উপায় হল স্বাধীন এক পরিসংখ্যান দফতর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজনে যার উপর সরকার, সংসদ কিংবা জনগণ নির্ভর করতে পারবে।

জন-পরামর্শ

তত্ত্ব হিসাবে উন্মুক্ত সরকারের ধারণা তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতার সংজ্ঞার থেকে অনেক ব্যাপক। এর অর্থ হল মন্ত্রীরা জনসমক্ষে গৃহীত নীতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবেন, বিতর্কে যোগ দেবেন এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে ও রূপায়ণের কাজে যতদূর সম্ভব সাধারণ মানুষের মতামত নেবেন। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত আইনের যেখানে জন-পরামর্শ গ্রহণের সময় ও পদ্ধতি বলা থাকবে, বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া নজির প্রকাশ এবং পরিবেশের উপর সরকারি নীতির প্রভাব যাচাই করার ব্যবস্থা থাকবে। উন্মুক্ততার অর্থ একদিকে সঠিক তথ্য সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করা ও অন্য দিকে সাধারণ মানুষের কথা শোনার মানসিকতা।

38. দায়বদ্ধ সরকারের অর্থ কি ?

দায়বদ্ধ সরকারের তিনটি প্রধান দিক।

আইনি দায়বদ্ধতা

প্রথম হল আইনি দায়বদ্ধতা। এর অর্থ নির্বাচিত বা অনির্বাচিত—সমস্ত ধরণের সরকারি পদাধিকারীর বিচার বিভাগের কাছে বা কোর্টের কাছে দায়বদ্ধতা। 'আইনের শাসনের' মূল তত্ত্ব হল : আইন ও নীতি যারা তৈরি করে এবং রূপায়ণ করে তারা সকলেই আইন ও সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করতে বাধ্য।

রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা

দ্বিতীয় ধারণাটি হল রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা : সংসদ ও জনসাধারণের কাছে সরকার বা প্রশাসনের বাধ্যতামূলক জবাবদিহি। গৃহীত নীতির যৌক্তিকতা, কেন কোন নীতিকে অধিকার দেওয়া হল এবং কিভাবে সেই নীতি রূপায়ণ করা হয়েছে—এ সবই সংসদ এবং জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করতে সরকার বাধ্য। আদালতের কাছে সরকারি পদাধিকারীর দায়বদ্ধতার ধারণার তুলনায় এই রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ধারণাটি অনেক বেশি জটিল। জাতীয় স্তরে অনির্বাচিত সরকারি সংস্থাগুলি (প্রশাসনের কাজে যুক্ত আমলাতন্ত্র, সশস্ত্র সেনাবাহিনী, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী) সরকার বা প্রশাসনের নির্বাচিত

প্রধানের কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু মুখ্য প্রশাসন ও মন্ত্রীরা একদিকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, অন্যদিকে জনগণের প্রতিনিধি সংসদ বা আইনসভার কাছেও জবাবদিহি করতে বাধ্য। আইনসভার সদস্যরা আবার তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
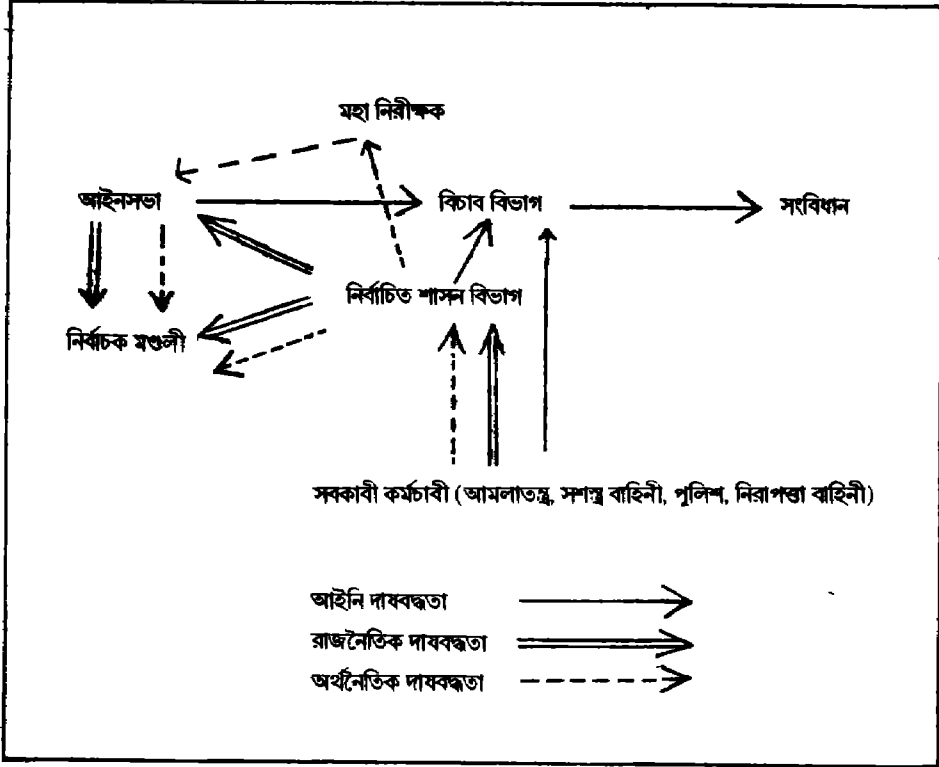
2 নং নকশা : দায়বদ্ধতার গতিমুখ

অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা

তৃতীয় ধারা অর্থাৎ আর্থিক দায়বদ্ধতার পরিধি সঙ্কীর্ণ। এর অর্থ এই যে কর আদায় করে সরকার যা খরচ করবে তা যেন আইন সভার অনুমতিতে যথাসম্ভব পরিমিত হয়। এ ক্ষেত্রে জবাবদিহির ধরণ রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার মত, তবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল এ বিষয়ে মহা-নিরীক্ষক বা অডিটর জেনারেলের দফতর। এই দফতর সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হলেও সরকারি খরচপত্র যাচাই করার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করে।

দায়বদ্ধতা ও গণ নিয়ন্ত্রণ

এই বিভিন্ন দায়বদ্ধতার গতিমুখ দুই নম্বর রেখা চিত্র থেকেই অনুমান করা যাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারের উপর গণনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হলেও আর্থিক ও বিধিসম্মত দায় বহুলাংশে পেশাদার সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থাগুলির যেমন নিজস্ব কিছু পেশাদার নীতি আছে তেমন আবার জবাবদিহি করার দায়িত্বও আছে। আর সবথেকে বড় কথা হল রাজনৈতিক কিম্বা জনগণের প্রভাব এদের প্রভাবিত করতে পারে না। অবশ্য কোন পরিস্থিতিতেই রাজনৈতিক দায়কে উপেক্ষা করার পথ নেই। বিচারালয় যাই রায় দিক কিম্বা মহা নিরীক্ষক আয় ব্যায়ের হিসাব যে ভাবেই পরীক্ষা করুন শেষ পর্যন্ত সেগুলি কিন্তু সংবিধানের নিয়মানুসারে সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুমোদন সাপেক্ষ।

39. ক্ষমতার পৃথকীকরণ জরুরি কেন?

গণতান্ত্রিক সরকারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় : শাসন বিভাগ (সোজা কথায় যাকে সরকার বলা হয়) এর কাজ নীতি নির্ধারণ এবং সেই নীতি প্রয়োগ করা; আইন সভা (চলতি কথায় সংসদ, প্রতিনিধি সভা কিম্বা জাতীয় পরিষদ) এর কাজ আইন ও কর অনুমোদন এবং সরকারি কাজকর্মের সমীক্ষা করা; বিচার বিভাগ (সাধারণ অর্থে ন্যায়ালয় বা বিচারালয়) এর কাজ হল আইন মান্য করা হচ্ছে কিনা দেখা অর্থাৎ আইন ভঙ্গ করলে দোষীদের শাস্তি দেওয়া। আগে যে বিভিন্ন ধরনের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়িত করতে হলে এই তিন বিভাগের ক্ষমতার বিভাজন অত্যন্ত জরুরি। (প্রশ্ন 38) তাই বিচার বিভাগ যদি প্রশাসন ও আইনসভার প্রভাব থেকে স্বাধীন না হয় তাহলে নির্ভয়ে ও পক্ষপাতহীন হয়ে তারা সরকারি কর্মচারীদের আইনের গণ্ডীতে বাঁধতে পারবে না। ঠিক সেই রকম সংসদ যদি স্বাধীনভাবে আইন ও কর অনুমোদন না শাসন বিভাগের কর্ম পদ্ধতি সমীক্ষা করতে না পারে তাহলে জনসমক্ষে সরকারের রাজনৈতিক ও আর্থিক দায়বদ্ধতা অর্থহীন হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন ব্যবস্থা

শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ যদিও সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই দেখতে পাওয়া যায় তবুও অবস্থা ভেদে প্রয়োগের তারতম্য ঘটে। রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় প্রশাসনিক নির্বাচন আলাদাভাবে হয় এবং রাষ্ট্রপতিরসঙ্গে আইন সভার কোন সম্পর্ক থাকে না তাই সে ক্ষেত্রে ক্ষমতাকে স্পষ্ট ভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রধানমন্ত্রী শাসিত ব্যবস্থায় প্রধান প্রশাসক মনোনীত হন সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসাবে। তাই সে ক্ষেত্রে প্রধান প্রশাসক হিসাবে এবং সংসদের গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি দুই ক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকেন।

রাষ্ট্রপতি শাসন

সব পদ্ধতিরই সুবিধা-অসুবিধা দুই আছে। রাষ্ট্রপতি শাসনের সুবিধা হল আইনসভা অনেক স্বাধীনভাবে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। অবশ্য এই স্বাধীনতার পরিধি বহুলাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন এবং উভয় শাখার উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। অসুবিধা হল এই ব্যবস্থায় সরকার অনেক সময় এমন 'যাঁতাকলে' পড়ে যায় যে প্রয়োজনীয় আইন ও করনীতি নিশ্চিত করার ক্ষমতাও তার থাকে না। এরফলে যে সব কর্মসূচীর ভিত্তিতে শাসকদল ক্ষমতায় আসে সেগুলি রূপায়ণ করাও আর সম্ভব হয় না।

সংসদ ও শাসনবিভাগ

প্রধানমন্ত্রী প্রথার সুবিধা হল এই ব্যবস্থায় শাসনবিভাগের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ও করনীতি প্রণয়ন করা সহজ এবং সংসদ ভেঙে দেওয়ার আশঙ্কা (নবীন গণতন্ত্রে এই আশঙ্কা বেশি প্রাসঙ্গিক) কম থাকে। আবার এই ব্যবস্থার অসুবিধা হল সংসদের কর্মসূচীর উপরে শাসনবিভাগের খবরদারির আশঙ্কা ও শাসনবিভাগের কাজকর্ম খতিয়ে দেখার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সংসদ পালন করে তা সীমিত হয়ে পড়া। এর কারণ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেরা সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার থেকে তার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার ব্যাপারেই বেশি উদ্যোগী হয়। সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতার উপরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের সদস্যপদ ও ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা নির্ভর করে।

40. আইনের শাসন কি ? কিভাবে এটি সুরক্ষিত রাখা যায় ?

আইনের শাসনের সহজ অর্থ হল নির্বাচিত অথবা অ-নির্বাচিত সব ধরণের সরকারি পদাধিকারীকেই আইন ও সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে আইনসিদ্ধ, নির্দিষ্ট ক্ষমতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে (আইনি দায়বদ্ধতা-প্রশ্ন 38 দেখুন)। শ্রেষ্ঠ সরকার হল সেই যেখানে 'মানুষের শাসন নয় আইনের শাসন চলে'—অ্যারিস্টটলের এই তত্ত্ব বর্তমান আইনের শাসনের ধারণার সূচনা। স্বৈরাচারী শাসক ও তাঁর কর্মচারীদের খামখেয়ালি নীতির বিরুদ্ধে যে কোন শাসনতান্ত্রিক কাজের জন্য আইনি বৈধতা আদায়ের সংগ্রাম থেকেই আইনের শাসনের ধারণা আধুনিক চেহারা পায়।

গণতন্ত্র ও আইনের শাসন

আইনের শাসন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র উভয়ের জন্যই আবশ্যক। আইনের শাসন ছাড়া সরকারের হাত থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার কোন উপায় নেই। আইনের উৎস যতক্ষণ গণতান্ত্রিক সংবিধান ও নির্বাচিত আইনসভা ততক্ষণ গণতন্ত্রে শাসনবিভাগকে

সেই আইন মেনে চলতে হবে। জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে কিংবা জনগণের তাৎক্ষণিক দাবির কাছে নতিস্বীকার করে আইন ও সংবিধানিক পদ্ধতি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা তাই অগণতান্ত্রিক।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা

আইনের শাসন অবশ্য ততক্ষণই কার্যকর যতক্ষণ তা তুলে ধরার মতো স্বাধীন বিচারবিভাগের অস্তিত্ব রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিচারবিভাগ সংক্রান্ত মৌলিক নীতির 1 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখবে এবং দেশের আইন বা সংবিধানের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা স্থাপিত হবে।' এই স্বাধীনতার অর্থ হল সামগ্রিকভাবে বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠানটির শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার ক্ষমতা এবং আলাদা আলাদাভাবে বিচারপতিদের নির্ভয়ে, নিরপেক্ষভাবে কাজ করার স্বাধীনতা। এই দুই ধরনের স্বাধীনতাই যতটা না সংবিধানিক আশ্বাসের উপর তার থেকেও বেশি নির্ভরশীল বিচারপতিদের নিয়োগের পদ্ধতি ও তাঁদের কার্যকালের মেয়াদের নিশ্চয়তার উপর। বিচারপতিদের নিয়োগের বিষয়টি সরকার বা শাসনবিভাগের হাতে থাকা উচিত নয়। সংসদীয় কমিটি অথবা সংবিধান অনুমোদিত কোনও স্বাধীন বিচারবিভাগীয় কমিটির হাতেই বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া উচিত। একইভাবে বিচারপতিদের বরখাস্ত করার ক্ষমতাও সরকারের হাতে থাকা উচিত নয়। এই ক্ষমতাও থাকা দরকার বিচারপতিদের যাঁরা নিয়োগ করবেন কেবল তাঁদের হাতেই। তবে সীমিত কয়েকটি কারণ যেমন দুর্নীতি বা কর্তব্যে অবহেলার মতো গুরুতর অভিযোগ ছাড়া বিচারপতিদের বরখাস্ত করাও যাবে না। আইনজীবীদের অন্যান্য পেশাতেও এই একই শর্ত প্রযোজ্য। আইনের শাসন সুনিশ্চিত করতে হলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে এই পেশায় জড়িত ব্যক্তিদের স্বাধীনতা জরুরী।

41. সরকারের দায়বদ্ধতার ব্যাপারে সংসদ বা আইনসভার কি ভূমিকা?

শাসনবিভাগের কাছ থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জবাবদিহি আদায়ের ক্ষেত্রে সংসদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আইন ও করনীতি অনুমোদনের ক্ষমতার সাহায্যে সংসদ এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করে। কোন বিষয় আইন হওয়ার আগে সেটি নিয়ে যথেষ্ট পর্যালোচনা ও বিতর্ক হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার ক্ষমতাও সংসদের হাতে। তা ছাড়া মন্ত্রীদের প্রশ্ন করে, নথিপত্র খতিয়ে দেখে বা সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীকে প্রশ্ন করে শাসনবিভাগের কাজকর্ম তদারকি করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসিয়ে অথবা বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট কমিটির সাহায্যে সংসদ এই দায়িত্বগুলি পালন করে।

সংসদের কার্যকারিতা

সরকারের জবাবদিহি আদায়ের ব্যাপারে সংসদ কতটা কার্যকরী তা বহুলাংশে নির্ভর করে স্বাধীনচেতা সদস্যদের উপর। এক সময় মনে করা হত যে সংসদীয় অধিবেশনে তাদের বক্তব্য নির্ভয়ে বলার নিরাপত্তা হিসাবে অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলেই তাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে সরকারি কাজকর্মের পরিধি ও জটিলতা বেড়ে গেছে, সেখানে মনে করা হয় যে প্রতিনিধিরা উপযুক্ত সমালোচনার যোগ্য হবেন অনুসন্ধান মূলক গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ পেলে এবং প্রয়োজনে পেশাদার বিশেষজ্ঞের সাহায্য পেলে। তার সঙ্গে এটাও জরুরী যে তাঁরা যেন নেতৃত্ব লাভের আশায় দলের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়েন—তাহলে তাঁদের সমালোচনার ক্ষমতাই ভোঁতা হয়ে পড়বে। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার আশায় বা কোন বিশেষ সমিতির সদস্য মনোনীত হওয়ার আশায় যদি সাংসদরা দলীয় নেতাদের তোষণ করে চলেন তাহলে সংসদীয় কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

বিরোধীর ভূমিকা

তবুও বলতে হবে যে সরকারকে যাচাই করতে সংগঠিত দলগুলির ভূমিকা নস্যাৎ করলে চলবে না। স্বীকৃত বিরোধীদল যে শুধু 'অপেক্ষমান বিকল্প সরকার' গঠনের আশায় কাটিয়ে দেবে তা নয়, বরং প্রতিনিয়ত সমালোচনার কাজকে সংঘবদ্ধ করে সরকারের কাজকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে চলবে। কারও কারও মতে সংসদীয় প্রথায় এটাই সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় দিক, কারণ সরকারি কাজে কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক নিজেদের জাহির করার জন্যেই সরকারের বিরোধিতা করা হয়। এই ধারণা বিশেষ করে প্রযোজ্য ব্রিটিশ বা তাদের প্রভাবে যে সমস্ত সংসদ গড়ে উঠেছে সেখানে। তবুও এ কথা মানতে হবে যে আধুনিক সরকার যে রকম সংগঠিত হয়ে উঠেছে, ঠিক ততটাই সংগঠিত হওয়া উচিত নিরীক্ষণ প্রণালী। এই দায়িত্ব বর্তায় বিরোধী দলগুলির উপর যারা অকুতোভয়ে প্রকৃত দেশভক্তের মত সরকারকে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

42. সংসদের সদস্য কি যে কেউ হতে পারে?

আমরা প্রতিনিধিদের এইজন্যে নিবাচন করি না যে তারা বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের অধিকারী, বরং এই জন্যে করি যে আমাদের বিশ্বাস তারা মনেপ্রাণে তাদের নির্বাচন কেন্দ্রের স্বার্থ রক্ষা করবে, সরকারি কাজ ও প্রস্তাব যাচাই করবে এবং যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে তারা নির্বাচিত হয়েছে সেগুলি কার্যকরী করবে। যে কোন বুদ্ধিমান, বিবেকবান, সংগঠিত এবং স্পষ্টভাষী ব্যক্তি, তা সে সমাজের যে কোন স্তর থেকেই আসুক না কেন, এই কাজে পারদর্শিতা দেখাতে পারে। একবার নির্বাচিত হলে, প্রয়োজনীয় সময় ও

সুযোগসুবিধের সদ্ব্যবহার করে প্রতিনিধিরা তাদের কাজে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে। সময়কালে তাদের এই অভিজ্ঞতা বাড়বে। তবে প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতার একটা প্রয়োজনীয় শর্ত এই যে কেউ তাদের আজীবন পদটি বহাল রাখার নিরাপত্তা দিতে পারে না।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা

কাজে কাজেই অনেকে প্রতিনিধির যোগ্য কাজ করতে সক্ষম হলেও, খুব কম লোকে বাস্তবে তা করে। সাফল্যের পথ দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ। আবশ্যিকভাবে প্রায় প্রত্যেককে কোন না কোন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে বহু বছর কাজ করতে হয়, এমনকি স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে নির্বাচিত হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। তারপর নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় দলীয় মনোনয়ন বোর্ড বা সমিতির সামনে, অন্য দলের সদস্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং তারপরেও হয়তো একটি বা দুটি সাধারণ নির্বাচনে অসাফল্যের শিকার হয়ে অবশেষে দলের তালিকায় তারা 'সম্ভাব্য বিজয়ীর' স্বীকৃতি পায়। তা সত্ত্বেও হয়তো দেখা গেল কোন বিশেষ বছরে দলের ভাগ্য খারাপ। কাজেই, প্রতিনিধি হতে গেলে যেমন দৃঢ়চেতা হওয়ার প্রয়োজন, তেমনি দরকার কপাল। তারাই টিকে থাকতে পারে যাদের সর্বজনীন বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ ও দিনরাত এক করে খাটবার ক্ষমতা আছে।

43. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কি অন্য কোন চাকরি বা লাভজনক কাজে নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত?

এর পক্ষে বলা হয় যে সংসদে সারা বছরের মত যথেষ্ট কাজ থাকে না, রাজনীতিতে প্রতিভাশালী লোকেদের টানার মত যথেষ্ট রোজগারের ব্যবস্থা সংসদে নেই এবং বাইরের কাজে নিযুক্ত থাকলে সদস্যরা 'বাস্তব দুনিয়ার' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে। এই যুক্তির কোনটাই দৃঢ়প্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়ে নেই। সংসদের অধিবেশন সারা বছর ধরে না চললেও, সংশ্লিষ্ট কাজ চলতেই থাকে এবং তার পরিশ্রমও অনেক—কাজটি তাই সর্বসময়ের। আশা করা যায় যে ভোটাররা বিষয়টি বোঝেন এবং তাই প্রতিনিধিদের দায়িত্বের কথা ভেবে তাঁদের ভরণপোষণ ও সুযোগসুবিধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মাসোহারা জোগাতে তাঁরা পিছপা হবেন না। আর বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার সোজা উপায় হল প্রতিনিধিরা তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রের মানুষ বা সেখানকার প্রতিটি গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলবেন ও তাঁদের বক্তব্য শুনবেন।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ

জনপ্রতিনিধিদের কি বাইরের কোন সংস্থা বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের প্রতিনিধিত্বের পারিশ্রমিক বাবদ আর্থিক সাহায্য নেওয়া উচিত? বহু দেশের সংসদে এই পারিশ্রমিক নেওয়ার প্রথা চালু থাকলেও ব্যাপারটি বাঞ্ছনীয় নয়।[1] কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের হয়ে এমনকি জাতীয় স্তরেও কাজ করার জন্য টাকা নিলে জন-প্রতিনিধিরা তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর সামগ্রিক প্রতিনিধিত্ব করবেন কিভাবে? এই ধরনের আর্থিক সাহায্যের নথিপত্র পেশ করা বাধ্যতামূলক করার থেকে প্রথাটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়।

মেয়াদ শেষ

জনপ্রতিনিধি পদটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে ভোটদাতারা হঠাৎই প্রতিনিধির কার্যকালের মেয়াদ শেষ করে দিতে পারেন। সবসময় যে কোন বিশেষ প্রতিনিধির ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কারণেই এমনটা করা হয় তা নয়। কোন দলের নেতৃত্ব বা কর্মসূচী আর গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করলেও ভোটদাতারা ওই দলের প্রতিনিধিকে সরাতে চাইতে পারেন। বাজারের গতিপ্রকৃতি বদলের জেরে বেসরকারি সংস্থার কর্মচারীরা যেমন তাঁদের নিজস্ব কোন ত্রুটি না থাকলেও ছাঁটাই হয়ে যেতে পারেন, জন-প্রতিনিধিদের কাজের মেয়াদ শেষের ব্যাপারটাও সেইরকমই। এই দুই ধরণের কর্মচারীদের তাই তাঁদের কাজের মেয়াদ ফুরোলে যতদিন তাঁরা কাজ করেছেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন পরিমাণ অর্থ দেওয়া উচিত যাতে তাঁরা বিকল্প জীবিকা খুঁজে নেওয়ার অবকাশ পান। সেইসঙ্গে জনপ্রতিনিধিদেরও পেনশনের সুযোগ থাকা দরকার।[2]

44. রাজনৈতিক দুর্নীতি কিভাবে উচ্ছেদ করা যায়?

রাজনৈতিক দুর্নীতি—ব্যক্তিগত লাভের জন্য রাজনৈতিক পদের অপব্যবহার সরকারের যে কোন স্তরে, যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঘটতে পারে। কিছু কিছু গণতন্ত্রে বিষয়টিকে রাজনৈতিক পদে থাকার 'অতিরিক্ত সুবিধা' বলে মনে করা হয় এবং সরকারি বরাত বা ব্যবসার লাইসেন্স আদায়ের প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এর ফলে জনপ্রতিনিধি ও তাঁর ভোটদাতাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনে চিড় ধরে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা লোপ পায় এবং শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলেই মানুষ আর মনে

---

1 ভারতে এই ধরনের আর্থিক সাহায্য দেওয়া বা নেওয়াকে দুর্নীতি বলে মনে করা হয়।—পৃ: 72

2 ভারতে সংসদ ও রাজ্য আইনসভার সদস্যরা তাঁদের কার্যকালের হিসাব অনুযায়ী পেনশন পাওয়ার অধিকারী।—পৃ· 72

করে না। এই কারণে রাজনৈতিক দুর্নীতির সমস্যাটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার এবং পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে না পারা গেলেও সরকারি পদের অপব্যবহার যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা হওয়া উচিত।

শোধরানোর উপায়

রাজনৈতিক দুর্নীতি যে যে পরিস্থিতিতে বিস্তার লাভ করে সেগুলি হল : যখন সরকারি পদের পারিশ্রমিক অন্যান্য পদের তুলনায় কম হয় বা যথেষ্ট না হয়; অথবা উল্টোদিক থেকে সরকারি পদ দখলই ভদ্রস্থ উপার্জনের একমাত্র রাস্তা হয় এবং বেসরকারি সংস্থার যাবতীয় আর্থিক উন্নতি সরকারি সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভরশীল হয়; এবং ধরা পড়া ও শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এই পরিস্থিতিগুলি থেকেই তাদের প্রতিষেধক বাতলে দেওয়া যায়। প্রতিষেধকগুলি হল : অন্যান্য জীবিকার তুলনায় বেশি না হলেও সরকারি পদের পারিশ্রমিক যথেষ্ট হওয়া উচিত; বেসরকারি আর্থিক সংস্থার ব্যাপারে যাবতীয় সরকাবি সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট আইন ও পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা; উন্মুক্ত সরকাব ও অনিয়মের অভিযোগে নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্তের নিশ্চয়তা। দুর্নীতির সব থেকে ভাল প্রতিষেধক হল ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন সরকারি কাজের ঐতিহ্য গড়ে তোলা। বাজার অর্থনীতির যে মূল দর্শন—ব্যক্তিস্বার্থের চরম সিদ্ধি তা এই নিঃস্বার্থ সরকারি কাজের ধারণাকে যত কম প্রভাবিত করে ততই ভাল। তবে দুর্নীতি যেখানে গেঁড়ে বসেছে সেখানে এই প্রতিষেধকগুলির প্রয়োগ সহজ নয়। বিশেষ করে শেষটির প্রয়োগ তো একেবারেই সহজ নয়।

45. গণতন্ত্রে আমলাতন্ত্রে কি ভূমিকা?

দৈনন্দিন কাজের জন্য সরকার যার উপর নির্ভরশীল সেই স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্তম্ভ হল অনির্বাচিত পূর্ণ সময়ের সরকারি কর্মচারী বা আমলাতন্ত্র। আইন ও নীতি নির্ধারণের সময়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দেওয়া ও সেই নীতি কাজে রূপায়ণের উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি রাখা আমলাতন্ত্রের দায়িত্ব। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক এবং ক্ষমতাসীন দলের নীতির সঙ্গে মতৈক্য হোক বা না হোক আমলারা নিরপেক্ষভাবে, নীতিনিষ্ঠ থেকে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন সেটাই আশা করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে সবধরণের সরকারেই আমলাতন্ত্র একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও গণতন্ত্রে আমলাতন্ত্রের সংগঠন কেমন হবে তা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। এগুলি হল : উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ কিভাবে হবে; আমলারা তাদের কাজের জবাবদিহি কার কাছে করবে এবং সাধারণভাবে আমলাদের নিয়োগের পদ্ধতি কি হবে।

রাজনৈতিক নিয়োগ

প্রথম প্রশ্নটি প্রায়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে। উচ্চপদস্থ আমলারা কেউ কেউ যেহেতু ক্ষমতাসীন দলের নীতির সঙ্গে সহমত হন না তাই আশঙ্কা করা হয় যে তাঁরা সরকারের নীতি রূপায়ণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন; কিংবা মন্ত্রীদের 'একপেশে' পরামর্শ দেবেন। মন্ত্রীদের তুলনায় বিশেষজ্ঞসুলভদক্ষতা আমলাদের বেশি থাকায় এই আশঙ্কা আরও বাড়ে। তবে এতখানি উদ্বেগের বাস্তব কারণ নেই। প্রতিটি খসড়া নীতির সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োগের সমস্যা এবং নীতি রূপায়ণের পদ্ধতি খতিয়ে দেখা আমলাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে অনির্বাচিত আমলাতন্ত্রের স্বভাব যে সরকারি নীতির উপরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে কথাও সত্যি এবং অনির্বাচিত সদস্যদের এই প্রভাব গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রয়োগ নাও করা হতে পারে। এই সম্ভাবনাকে সীমিত করার প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র নিম্নলিখিত যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমটি হল, প্রতিটি মন্ত্রিসভার প্রধান সচিবের পদগুলির মনোনয়ন রাজনৈতিক পদ্ধতিতে করা এবং প্রতিটি নতুন সরকারের সচিব নিযুক্তি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী করা। দ্বিতীয়টি হল প্রতিটি মন্ত্রকে একটি করে রাজনৈতিক দফতর খোলা যার দায়িত্বে থাকবেন বিশেষজ্ঞ দলীয় সমর্থকেরা, প্রয়োজনে এঁরাই মন্ত্রীকে বিকল্প উপদেশ ও পরামর্শ সরবরাহ করবেন এবং স্থায়ী প্রশাসক ও আমলাদের পরামর্শ স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারবেন। দুটি পদ্ধতির কোনটাই সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নয় তবে সুবিধা অসুবিধার তুলনায় বেশি।

আমলাতন্ত্রের দায়বদ্ধতা

দ্বিতীয় বিষয়টি হল আমলা বা প্রশাসকদের দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহি সম্পর্কিত। প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র ধাপে ধাপে সংগঠিত। তাদের কাজের জবাব দিতে হয় ক্রমোচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের। ধাপে ধাপে এই জবাবদিহির দায় বর্তায় মন্ত্রীর কাছে এবং মন্ত্রীর মাধ্যমে সংসদে। গণতন্ত্রে সরকারি আমলাদেরও কি আইন, সংসদ ও জনগণের কাছে এমন দায় নেই যা তাদের উচ্চপদস্থের কাছে দায়বদ্ধতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে? কি হবে যদি তাঁরা এমন নির্দেশ পান যার অর্থ আইনকে উপেক্ষা করা কিম্বা সংসদকে প্রতারণা করা অথবা যাঁদের সেবায় তাঁরা নিযুক্ত তাঁদের ঠকানো হয়? এই ধরণের উদাহরণ আমলাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে দায়বদ্ধতার বিরোধ প্রমাণ করে এই ধরণের সংকটে আমলারা অনেকসময় তথ্য ফাঁস করে দেন। তাই এঁদের সুরক্ষার প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের পক্ষে এটাই একমাত্র যুক্তি (প্রশ্ন 37)।

সরকারি কর্মচারী নিয়োগ

উচ্চশিক্ষিত বা পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুশলী লোকেদের মধ্যে থেকে প্রতিযোগিতার

ভিত্তিতে বাছাই করে নতুন সরকারি কর্মচারীদের উৎকর্ষ বজায় রাখা হয় এবং এর সঙ্গে কোন ধরণের রাজনীতি অথবা দলের সম্পর্ক থাকে না। এভাবে নিয়োগ করলে মেধার উৎকর্ষ বজায় থাকে ঠিকই তবে খেয়াল রাখা উচিত যে এর ফলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ শ্রেণীর যেন সৃষ্টি না হয়। গণতন্ত্রে প্রশাসকেরা যাতে সমস্ত ধরণের সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হন সে দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া দরকার। তাছাড়া রাজনৈতিক সাম্যের আদর্শগত প্রয়োজন সামাজিক গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ভাবে সরকারি দফতরে নিযুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ সুবিধা প্রত্যেকের পাওয়া উচিত। তার অর্থ এই যে বৈষম্য দুর করতে এবং সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য দূর করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে তবেই সঠিক নিয়োগ সম্ভব।

46. দায়বদ্ধ সরকার গড়ে তুলতে ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকরা সাহায্য করতে পারে কিভাবে ?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারীদের বেআইনি সিদ্ধান্ত বা অপশাসনের (অবহেলা, টালবাহানা, স্বেচ্ছাচারিতা) জন্য ক্ষতি হলে নাগরিকদের তার প্রতিকার পাওয়ার রাস্তা খোলা আছে। সরকারি সিদ্ধান্ত যদি বিধিবদ্ধ ক্ষমতার বাইরে প্রয়োগ করা হয় তাহলে বিচারালয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। অপশাসনের প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন পেশ করার মাধ্যমে অথবা 'ওমবুডসম্যান'-র কাছে আবেদন করে যাঁর বিশেষ দায়িত্ব হল সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগের যথার্থতা খতিয়ে দেখা। ইদানিংকালে 'নাগরিক সনদ' নামে একধরণের সংস্থার উদ্ভব হয়েছে। সরকার যদি আশানুরূপ কাজ দেখাতে অসমর্থ হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করায় এই সংস্থা। ব্যক্তিগত স্তরে, এই ধরণের দায়বদ্ধতা আদায় করতে পারে প্রত্যেকে। এ ছাড়া, সমবেতভাবে দায়বদ্ধতা আদায় করার উপায় আগেই আলোচনা করা হয়েছে (প্রশ্ন 38 দেখুন)। মনে রাখতে হবে যে সরকারি পরিসেবার প্রধান গ্রাহক সাধারণ মানুষ এবং বৈধ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দায় শেষপর্যন্ত নাগরিকদের কাছে পূরণ করতে হবে সরকারকেই।

47. সেনাবাহিনীকে কিভাবে নাগরিক নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ?

সাবেকি গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্তে তফাৎ করা হয় এবং এর প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরে মেনে নেওয়া হয়েছে। কাজেই, মাঝে মধ্যে অস্ত্র-সংগ্রহ, নিযুক্তি ইত্যাদি নিয়ে মতদ্বৈধ হওয়া ছাড়া এসব দেশে বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দেয় না। অপরপক্ষে, যেসব দেশে ঘন ঘন অভ্যুত্থানের জেরে সরকার পাল্টায় বা সেনাবাহিনী যেখানে শাসন চালিয়ে এসেছে, বা যেখানে সরকারি পদাধিকারীদের কাজ বা নীতির বিরুদ্ধে

সেনাবাহিনী 'ভিটো' বা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষমতা পেয়ে এসেছে—সেইসব নব্যগণতন্ত্রের পক্ষে সেনাবাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। হাজার হলেও, সরাসরি কিম্বা সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে সেনাবাহিনী সর্বত্র নির্বাচিত রাজনীতিকদের গদিচ্যুত করতে পারে, সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে এবং সাধারণ মানুষকে নিজের শাসনাধীনে আনতে পারে। ব্যাপারটা নির্ভর করে তাদের ইচ্ছার উপর। প্রশ্ন হল, কি করে তাদের এই 'ইচ্ছা' প্রতিরোধ করা যায়।

সামরিক অভ্যুত্থান

সেনাবাহিনীকে নির্বাচিত রাজনীতিকদের অধীনে রাখার সোজা উপায় তাদের রাজনীতি-নিরপেক্ষভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বা তাদের মোটা মাইনে, পদ আর আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়ে যাওয়া। অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ দেখা দিলে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করতে পারে বটে, তবে সেটা কখনই প্রধান কারণ নয়। সেনাবাহিনী তখনই শাসনক্ষমতা নিজের হাতে নেয়, যখন বহুকাল পর্যন্ত গণতন্ত্র অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলে এবং রাজনীতিকরা সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে অসমর্থ হয়—যেমন, গৃহযুদ্ধ, নিরন্তর মুদ্রাস্ফীতি, জন-জীবনে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়া বা লজ্জাজনক রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি চলতে থাকা। আবার, প্রচলিত ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী এবং আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী দল যদি নির্বাচনে জেতার কাছাকাছি আসে বা সরকার গঠনের অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহলে সে সম্ভাবনা ব্যর্থ করতে সামরিক শাসন কায়েম হতে পারে। মোদ্দা কথা হল, অন্তর্নিহিত চরিত্রগত কারণে সামরিক শাসন স্থাপিত হয় না, হয় গণতান্ত্রিক সংগঠন ঠিকমত কাজ না করতে পারলে।

সামরিক শাসন

সামরিক শাসন কোন সমাজের সমস্যার সাময়িক সমাধান দিতে পারে, দীর্ঘকালীন সমাধান নিয়ে আসতে কখনই পারে না। দু' এক দশক আগেও গণতন্ত্রের দুর্নীতি পরায়ণ ও বিভেদসৃষ্টিকারী রাজনীতির তুলনায় সামরিক শাসনকে অর্থনৈতিক প্রগতি ও রাষ্ট্রনির্মাণের প্রকৃষ্ট মাধ্যম মনে করা হত। কিন্তু সেনাবাহিনীর পক্ষে বিধিসম্মত উপায়ে সরকার পরিচালনা অসম্ভব। সামরিক শাসনের নজির খুবই খারাপ। সরকার যদি গোপনীয়তা প্রবণ হয় তাহলে দুর্নীতি চাপা দেওয়া যায় বটে, আটকানো যায় না। সামরিক শাসনে অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনা কখনই সম্ভব হয় নি। তার উপর সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থাকাকালীন মানবাধিকার যে হারে লঙ্ঘন হয়েছে তা কোন উন্মুক্ত সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

গণতান্ত্রিক সংহতি

গণতন্ত্রের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উপযুক্ত সংগঠন, সাংবিধানিক সরকারও বিধির শাসনের প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমাদের সামনে কোন বিকল্প নেই। এর জন্য দরকার হলে আন্তর্জাতিক সাহায্য নিতে হবে, সমাজের মূল সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজতে হবে আপসে আলোচনার মাধ্যমে। সেইসঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি চিহ্নিত করে অপরাধীদের উপযুক্ত সাজা দেওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই। সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। যে রাষ্ট্র বা শাসক জোট মানবাধিকার লঙ্ঘন অনুমোদন করে তাদের বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর ব্যবস্থা।

48. গণতন্ত্রে গুপ্তচর বিভাগের কোন প্রয়োজন আছে কি?

গণতন্ত্র নীতিগত ভাবে কোন ধরণের গুপ্ত কাজের বিরোধী। তা সত্ত্বেও বিদেশি হামলার হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বানচাল করার চেষ্টায় অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র দমন করতে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে গুপ্তচর বিভাগের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, গুপ্তচরবৃত্তিতে যে সব উপায় অবলম্বন করা হয় যেমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজর রাখা, টেলিফোনে আড়ি পাতা, ও এই ধরণের অসংখ্য ছল-চাতুরি তাতে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। এই কাজগুলি এত গোপনে করা হয় বলেই গুপ্তচরবৃত্তি যে কোন সময়ে সীমা ছাড়াতে পারে। অনেক সময় সম্পূর্ণ বৈধ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেও গুপ্তচর লাগানো হয় ওই বিশেষ দলটি সরকারি নীতি ও কাজকর্মের পক্ষে অসুবিধাজনক বলেই।

রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা

রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপরই দেখা যাচ্ছে সব কিছু নির্ভর করছে। দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংসদের কাছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অথবা মন্ত্রীরা সাধারণভাবে জবাবদিহি করলেই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন এক বিশেষ সংসদীয় কমিটির যা দরকারে গোপনে মিলিত হয়ে সুরক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম ঠিক মত হচ্ছে কি না তদারক করবে ও ন্যায়সংগত নির্দেশ মেনে চলবে এ ছাড়া কেউ যদি অভিযোগ করে যে তার আইন সম্মত কাজকর্মের উপর নজরদারি তার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে তাহলে সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার অধিকার ওমবুডসম্যানের আছে।

49. গণতন্ত্রে স্থানীয় শাসন কেন প্রয়োজন?

স্থানীয় স্তরে নির্বাচিত শাসনব্যবস্থার সাহায্যে গণতন্ত্রকে মজবুত করার যৌক্তিকতা অনেক। এই ব্যবস্থায় সময়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভাগ নেওয়ার সুযোগ অনেক বেড়ে

যায়। স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আবার গৃহীত নীতি কিম্বা সিদ্ধান্তকে স্থানীয় স্তরে রূপায়ণ করতে গিয়ে অনেক ছোটখাট পরীক্ষামূলক কাজ করা যায় এবং তা সফল হলে সেই অভিজ্ঞতা সুবিধামত কাজে লাগানো যায়। জাতীয় স্তরে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে হাতে খড়ির পর রাজনীতিকরা ধাপে ধাপে জাতীয় স্তরে পৌঁছতে পারে এবং জাতীয় স্তরে হেরে যাওয়া রাজনৈতিক দলগুলি এখানে গড়ে তুলতে পারে নতুন ভিত্তি। সবথেকে বড় কথা হল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা জড়ো হতে না দিয়ে এই ব্যবস্থা সংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতার পৃথকীকরণে সহায়তা করে। স্থানীয় প্রশাসনের এই প্রতিটি বৈশিষ্টাই গুরুত্বপূর্ণ আর এক সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে নির্বাচিত স্থানীয় শাসনের তো কোন জবাবই নেই।

কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা

বর্তমানে বহু রাষ্ট্রেই নীতি নির্ধারণকে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে ক্ষমতাশালী মতামত কাজ করে। জাতীয় অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনার যুক্তি দেখিয়ে অর্থ দফতর সামগ্রিক সরকারি ব্যয়ের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সওয়াল করে। জাতীয় স্তরের রাজনীতিকরা কখনই চায় না স্থানীয় স্তরে কোন দল কেন্দ্রীয় নীতি বা উদ্যোগের বিরোধী হয়ে দাঁড়াক। তাছাড়া আজকের গতিশীল সমাজের নাগরিক সরকারি পরিষেবার মানে কোন রকম বৈষম্য বরদাস্ত করতে রাজি নয়। নাগরিক সাম্যের অর্থ সমান সরকারি পরিসেবা পাওয়ার অধিকার। বিভিন্ন এলাকায় সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সমমানের সরকারি পরিসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আবার এটা করতে গেলেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বশাসনের অধিকার খর্ব হয় এবং স্থানীয় নির্বাচকদের মনোনয়ন ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে।

পরস্পরবিরোধী প্রয়োজন

বিপরীতমুখী প্রয়োজনগুলির মধ্যে সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে বার করা কঠিন। তবু যেহেতু বর্তমানে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁকই সবথেকে প্রবল তাই আশু প্রয়োজন স্থানীয় শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। ন্যূনতম প্রয়োজন হল, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কার্যক্ষেত্র নির্বাচকদের বোধগম্য হয় এমনভাবে আলাদা করতে হবে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে থেকেও যাতে স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী কাজ করার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে; স্থানীয় নির্বাচক মণ্ডলীর হাতে যেন প্রশ্ন করার যথেষ্ট অধিকার থাকে; স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বাতন্ত্র্যে যেন কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ না করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে আদালতের সাহায্যে যেন এই অধিকারগুলি বলবৎ করা যায়। মোদ্দা কথা হল আইনের জালে না আটকে গিয়ে বরং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্তরে

সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। উভয়কেই স্বীকার করে নিতে হবে উভয়ের অধিকার।

50. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন কখন হয়?

যুক্তরাষ্ট্রের তাৎপর্য হল দেশের পুরো এলাকাকে আলাদা আলাদা রাজ্যে ভাগ করে প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব নির্বাচিত আইনসভা ও শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। যাতে তারা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংবিধান অনুমোদিত ক্ষমতা বিভাজনের নীতির ভিত্তিতে নিজস্ব আইন তৈরি ও কর আদায় করতে পারে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে—কখনও সাবেক সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিকে জোট বাঁধার সুযোগ দিয়ে, আবার কখনও বা সাবেক অখণ্ড রাষ্ট্রকে স্থানীয় বা রাজ্য স্তরে ভাগ করে।

আঞ্চলিক তারতম্য

যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন বিশেষ করে সেই দেশে দেখা যায় যার আকার বিশাল এবং এলাকায় এলাকায় কৃষ্টিগত ও ভৌগোলিক তারতম্য অনেক। অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বা জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকায় তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইলে সরাসরি স্বাধীনতা না দিয়ে তাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। একই ভূখণ্ডে থেকে নিরন্তর বিবাদ করা অথবা পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাওয়ার থেকে এই 'আপাত বিচ্ছিন্নতা' অনেক শ্রেয়। নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের পক্ষে সব যুক্তিই (প্রশ্ন 49) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

4

ব্যক্তি অধিকার ও তার সুরক্ষা

51. মানবাধিকার কাকে বলে?

মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও তার ক্ষমতার বিকাশের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য। মানবাধিকারের স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে সেই অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা বর্তমান শতকে নিঃসন্দেহে এক বিরাট নৈতিক পদক্ষেপ। মানবাধিকার সংক্রান্ত বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি বিশ্বসমাজ সম্পাদন করেছে। এই চুক্তিগুলিতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারকে অঙ্গীকার করানো হয়েছে যাতে তারা নিজ নিজ রাষ্ট্রে এই সব চুক্তির শর্তগুলি আইন করে কার্যকর করবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের মৌলিক ধারণাটি স্বচলিত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' থেকে। 1948 সালের 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণসভায় এই ঘোষণাপত্রটি গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে দুটি দলিল তৈরি হয় 1966 সালে। এই দুটি হল : আন্তর্জাতিক আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার চুক্তিপত্র এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তিপত্র। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র এই দলিলগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তিপত্রের সঙ্গেই একটি ঐচ্ছিক আচরণবিধি বা 'প্রোটোকল' রয়েছে। চুক্তিপত্র ঠিকমতো মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য গঠিত 'হিউম্যান রাইটস কমিটি'-র কাছে ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি আবেদন করার সুযোগ দিয়েছে উপরোক্ত ঐচ্ছিক আচরণবিধি। তবে এই সুযোগ তখনই কাজে লাগানো যাবে যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র চুক্তিপত্রের সঙ্গে সঙ্গে আচরণ বিধিকেও স্বীকার করে নেয়। খুব বেশি রাষ্ট্র তা করেনি।

আঞ্চলিক সম্মেলন

এই দলিলগুলি—অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, দুটি চুক্তিপত্র ও ঐচ্ছিক আচরণবিধি—একসঙ্গে করে তার নাম দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিশ্রুতিপত্র। এছাড়া, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্তরে আরও বহু মানবাধিকার দলিলের উল্লেখ করা যেতে পারে—আমেরিকার মানবাধিকার সম্মেলন, আফ্রিকার মানব ও লোক-অধিকার সনদ, ইউরোপীয় মানবাধিকার সম্মেলন ইত্যাদি। এগুলির উপর আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। মানবাধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া আছে।

52. অধিকারের শ্রেণীভাগ কিভাবে করা হয়?

অধিকারকে অনেকভাগে ভাগ করা যায়। তবে মুখ্যত নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারই স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিশ্রুতিপত্রেও এই শ্রেণীভাগ করা হয়েছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের উদাহরণ হল—জীবনের অধিকার, শারীরিক নির্যাতন থেকে মুক্তি, বেগার শ্রম থেকে মুক্তি, বিধিবহির্ভূত গ্রেফতারের হাত থেকে মুক্তি, ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার, চিন্তা-চেতনা-ধর্ম-বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত জীবনের অধিকার, মতপ্রকাশ ও সভা-সমিতির গঠনের স্বাধীনতা এবং সর্বসাধারণের কাজে ভাগ নেওয়ার অধিকার। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ব্যক্তি কিম্বা গোষ্ঠীর কাজে হস্তক্ষেপ করতে রাষ্ট্রকে বাধা দেয়। তাছাড়া, এগুলি কল্যাণমূলক কিছু কাজ করতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করে, যেমন—দরিদ্রদের জন্য বিশেষ আর্থিক সংস্থান যাতে স্বল্পবিত্তরা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে, বিশেষ করে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ এলে। আর একটি উদাহরণ হল সরকারি খরচে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রচারমাধ্যম ব্যবহারের সুবিধে করে দেওয়া।

আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের মধ্যে পড়ে—খাদ্য ও স্বাস্থ্য কিম্বা জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানপ্রাপ্তি, সমান কাজে সমান বেতন। সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান ও আবাসন, ধর্মঘট করার অধিকার, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ। বিশেষ করে আর্থিক ও সামাজিক অধিকারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায় কারণ ব্যক্তি তার নিজস্ব চেষ্টায় সব সময়ে সে সব অধিকার অর্জন করতে পারে না—যেমন, বেকাব বা প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষেত্রে।

বৈষম্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি

মানবাধিকার অনুশীলনের এক জরুরী সিদ্ধান্ত হল—লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ইত্যাদি

বিচারে কারও প্রতি কোন পাক্ষপাত বা বৈষম্য করা হবে না।

53. কিছু অধিকার কি অন্যগুলির তুলনায় বেশি মূল্যবান?

এর সোজা উত্তর হল—আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মানবাধিকারগুলি একে অপরের সঙ্গে জড়িত ও পরিপূরক। তবে, বিকাশের স্তরভেদে দেশের নাগরিক কিছু কিছু অধিকার ভাবনা-চিন্তা না করেই মেনে নেয়। যেমন ধনী দেশগুলিতে জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান, খাদ্য, আশ্রয়, পোষাক বা শিক্ষার অধিকার থাকা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু দরিদ্র দেশগুলিতে এসবই প্রধান বিচার্য বিষয়। তবে সব গণতান্ত্রিক সমাজে আর্থিক ও সামাজিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, আইনের শাসন দ্বারা শাসিত হওয়ার অধিকার, যথেচ্ছ গ্রেফতারের হাত থেকে রেহাই ও মত প্রকাশ এবং সভা সমিতি গঠনের অধিকারকে মৌলিক বলে মনে করা হয়। এগুলির সুরক্ষাও তাই জরুরি। আন্তর্জাতিক আইন অনুসাবে প্রতিটি নাগরিক যাতে সমান মানবাধিকার ভোগ করে তা দেখা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

54. মানবাধিকার কি সর্বজনীন?

হ্যাঁ, মানবাধিকার সর্বজনীন। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও ক্ষমতা পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে স্বীকৃত। অবশ্য আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে ভেদাভেদ নিয়েই এই পৃথিবী। অনেক সময় বলা হয়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার যেহেতু ব্যক্তিকে কেন্দ্র কবেই নির্ধারিত হয় যেহেতু কিছু সমাজে ব্যাপারটা বে-মানান বা বিদেশিদের আবোপ করা। এইসব সমাজে ব্যক্তিকে সমাজের থেকে আলাদা করে দেখা হয় না এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বকেই প্রাথমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আসল কথা হল পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ যে কোন ভূখণ্ডেই ব্যাপারটা প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত মানবাধিকাবেব ধারণা সমাজের সঙ্গে তার সদস্যদের সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তুলছে কি না এখন সেটাই দেখা দরকার। অবশ্যই তুলছে। সেইসঙ্গে এ কথাও বলা দরকাব যে ব্যক্তিগত মানবাধিকার মানুষের একতা বা সামাজিক সংহতি নষ্ট করে এমন কোন নজির নেই। বরং সর্বজনীন মানবাধিকারের আদর্শ হল বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেন তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাত্রার নিজস্বতা বজায় রেখে পরস্পবের কাছাকাছি আসে ও সমবেত ভাবে নিজেদের অধিকারগুলি সুরক্ষিত বাখে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন প্রাথমিক স্তরে সব মানুষের অধিকার প্রাপ্তিব অঙ্গীকার করে এবং তার পর স্বীকার করে যে সংস্কৃতির বিকাশে সবাই তার নিজস্বতা বজায় রাখতে পারবে তা সে আদিবাসী হোক বা অন্য কেউ।

সমস্ত মানবাধিকারই সব দেশে সমান গ্রাহ্য

অধিকার এবং কর্তব্য

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে অন্যের সাহচর্যে ব্যক্তিব স্বাধীন ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনার উপরেও। অবশ্য এ কথা স্বীকার কবতেই হবে যে মানবাধিকার যে আদর্শগত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের নিজস্বতা (প্রশ্ন 2 দেখুন)।

ভেদাভেদহীন মান

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সর্বজনীন মান সম্পর্কে এর সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করে থাকেন। কারো কারো বক্তব্য হল সমস্যা যতটা না সংস্কৃতিক তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল অগ্রাধিকার কাকে দেওয়া হবে ব্যক্তি না সমাজকে সেই প্রশ্ন। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে মানবাধিকারের ব্যাখ্যাও ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তা সর্বজনীনতাকে উপেক্ষা করে। এর থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত সমস্যা একই ভাবে মোকাবিলা করে না। প্রায়শই একে অপরকে দোষারোপের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতার সম্পর্ক দেখা গেছে যে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র তার বিরোধী রাষ্ট্রের সমালোচনা করছে সেই একই পরিসংখ্যান যখন তার মিত্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তখন কিন্তু তারা চুপ করে থাকছে। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের পক্ষে যদি জনমত গড়ে তুলতে হয় তাহলে এমন এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড গড়ে উঠবে নিরপেক্ষ বাস্তব বিচারে প্রতিটি রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান যাচাই করে।

ভিয়েনা সম্মেলন

1993 সালের জুনে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি এবং এই ক্ষেত্রে বিশ্বসমাজের দায়িত্বের বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়।

> মানবাধিকার মাত্রই সর্বজনীন, অবিভাজ্য একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত ও পরস্পরের উপব নির্ভরশীল। মানবাধিকার বিচার করতে হবে বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত্রে, সর্বত্র একই রকম গুরুত্বেব সঙ্গে তা প্রয়োগ করতে হবে। জাতীয় ও আঞ্চলিক বিশেষত্ব এবং ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের বিভিন্নতার কথা মাথায় রেখেই প্রতিটি রাষ্ট্রকে যাবতীয় মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকাব রক্ষা করতে হবে—তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামো যাই হোক না কেন। (অন্তিম দলিল, পরিচ্ছেদ 3)

55. কোন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ প্রকাশ কি সঙ্গত?

রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে লিপিবদ্ধ আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল নীতিই হল—কোন দেশ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপাবে নাক গলাবে না। তবে বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এই কথা আজ নীতিগত ভাবে স্বীকার করা হয় যে—নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবহার সর্বসাধারণের জন্য প্রনীত আইনের আওতায় পড়ে এবং বাইরের কোন সরকারি বা বেসরকারি সংগঠন (এন জি ও) যদি তার সমালোচনা করে তবে তা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করা হবে না। মানবাধিকার বিশ্ব সম্মেলন তাই জানায় : 'মানবাধিকারের উন্নতি ও সুরক্ষা আন্তর্জাতিক মানব-সমাজের ন্যায্য উদ্বেগের বিষয়।' (অন্তিম দলিল, অনুচ্ছেদ 2.2)

56. মানবাধিকারের সঙ্গে গণতন্ত্রের কি সম্পর্ক?

মানবাধিকার সম্পর্কে বিশ্ব সম্মেলনের অভিমত হল এর সঙ্গে গণতন্ত্রের (সেই সঙ্গে উন্নয়নের) সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভবশীলতা ও শক্তিবৃদ্ধির উপর দাঁড়িয়ে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আন্তর্জাতিক মানব সমাজ আজ স্বীকার করে যে উন্নত বা উন্নয়নশীল যে কোন দেশেই মানবাধিকার ও আইনি শাসনের শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা সম্ভব গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে। এও স্বীকাব কবা হয় যে গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে মানবাধিকার ও স্বাধীনতা অবশ্য পালনীয়। আগে অনেকে মনে করতেন, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ব্যক্তিগতভাবে মানবাধিকার রক্ষা করা ও ভোগ করা সম্ভব—বিশেষকরে যে দেশে অর্থনৈতিক প্রগতিকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রমাণিত সত্য এই যে এই সব দেশ খুব তাড়াতাড়ি অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার, দুর্নীতি ও অস্থিবতার শিকার হয়।

মানবাধিকার হিসাবে গণতান্ত্রিক সরকার

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর আস্থা নতুন কিছু নয়। 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে' গণতান্ত্রিক সরকারের স্বীকৃতি আছে। এর একটি মুখ্য আদর্শ হল—'গণইচ্ছার ভিত্তিতে সরকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে'। (ধারা 21)। 'আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক চুক্তিপত্র' অনুযায়ী রাষ্ট্রকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে প্রতিটি নাগরিকের সুযোগ ও অধিকার থাকবে যাতে তারা 'সর্বজনীন কাজে ভাগ নিতে পারে—তা সে প্রত্যক্ষভাবে হোক বা প্রতিনিধির মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে হোক; ভোট দিতে পারে; নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনে ভাগ নিয়ে নির্বাচিত হতে পারে; সাধারণভাবে সমতার ভিত্তিতে সরকারি দফতরে কার্যভার সামলাতে পারে।' (ধারা 25)।

উন্নয়নের অধিকার

শীতল যুদ্ধের অবসানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে তারপর একথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে সর্বজনীন মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে এক পরস্পর নির্ভরশীলতার সম্পর্ক আছে। সেই সঙ্গে, উন্নয়নশীল দেশগুলিও উন্নয়নের অধিকার বাস্তবিয়িত করতে—মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি মজবুত করার প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েছে।

57. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে গণতন্ত্রের কি সম্পর্ক?

ব্যক্তির নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নিরাপত্তা গণতন্ত্রে এক দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, গণতন্ত্রের দুটি যুগ্মনীতি সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে রাজনৈতিক সমতা ও গণনিয়ন্ত্রণ কার্য করার জন্যই ব্যক্তির নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সুরক্ষা জরুরী। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি স্বাধীনতার এক্তিয়ার নির্দিষ্ট করে দিয়ে এই অধিকারগুলি সমবেত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণে রাখে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত কয়েকটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্ষেপে আলোচনা করলে এই অধিকারগুলির দ্বৈত ভূমিকা স্পষ্ট হবে।

ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সুরক্ষা

যথেচ্ছ গ্রেফতার, আটক করে রাখা, নির্বাসন ইত্যাদি আশঙ্কার হাত থেকে রেহাই না পেলে কোন নাগরিক কখনই রাজনৈতিক কাজে অথবা বিতর্কে মনোযোগ দিতে পারে না। এইজন্যই সংসদের কাজে নিযুক্ত থাকার সময় আইনসভার সদস্যদের সাধারণত গ্রেফতার করা যায় না। তবে গণতন্ত্রে এই অধিকার কেবল সাংসদের নয়, সকলেরই। গণতান্ত্রিক সমাজে জনপ্রিয় নয় এমন ব্যক্তিকেও স্বাধীনতা ও শারীরিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়—তা সে সংখ্যাগরিষ্ঠের অপছন্দ হলেও।

প্রয়োজনীয় পদ্ধতি

একই যুক্তিতে অন্যায় দোষারোপ, অসঙ্গত আচরণ, নিপীড়ন এবং পক্ষপাত দুষ্ট আইনি ব্যবস্থার হাত থেকে নাগরিককে রক্ষা করার প্রয়োজন তুলে ধরা যায়। যে সমাজে গণতন্ত্র বাতিল করা হয়েছে সেখানে বিরোধী রাজনীতিকদের শাস্তি দেওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। গণতান্ত্রিক সমাজে তাই প্রয়োজন রাজনৈতিক ও মতবাদগত স্বভাবমুক্ত স্বাধীনবিচারবিভাগ এবং আইনের শাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারি বিধির প্রয়োগ।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক সমাজে ধরেই নেওয়া হয় যে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে নিজের ইচ্ছামত চিন্তা-ভাবনা করার এবং নিজস্ব ধারণা, মতামত বা জীবন-দর্শন মেনে চলার। সেইমত, গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিকে অনেকের সঙ্গে মিলে ধর্ম ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অবশ্যই এই স্বাধীনতা অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই প্রয়োগ করতে হবে। চিন্তার স্বাধীনতা অবশ্যই ব্যক্তি-অধিকার হিসাবে সুরক্ষিত হবে যাতে ব্যক্তি গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করতে পিছপা না হয়—তা সে বিশ্বাস ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ যাই হোক না কেন। বিশেষ করে, ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যারা সংখ্যালঘু তারাও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সমান স্বাধীনতা ভোগের স্বীকৃতি পাবে।

মত প্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা

আমাদের গণতন্ত্রের সারাংশ এই যে প্রতিটি নাগরিক আর সবার মত শোনার বা জানার অধিকারী হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা তখনই মানবাধিকার হিসেবে গণ্য হবে যখন ব্যক্তি তার কথা শোনাবার সুযোগ-সুবিধা পাবে। বাক-স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক মান-নির্ণয়ে তাই শুধু বক্তব্যের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় না, সেইসঙ্গে 'ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে যে কোন মাধ্যমের সাহায্যে যে কোন ধ্যান-ধারণা ও তথ্যের খোঁজ করা বা পাওয়ার স্বাধীনতা', স্বীকার করা হয়। আধুনিক সমাজে তাই স্বাধীন গণমাধ্যমের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়। সেই স্বাধীনতা অবশ্য স্পষ্ট আইনের আওতায় ভোগ করতে হবে। তাতে, একদিকে যেমন ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত হবে, তেমনি অপরদিকে খবর সরবরাহ, সরকারের সমালোচনা এবং নীতি-নির্ধারণে বৃহত্তর তর্ক-বিতর্কের সুযোগ করে দেবে। (প্রশ্ন 6 দেখুন)।

তথ্যের স্বাধীনতা

গণতন্ত্রে উন্মুক্ত সরকারের সিদ্ধান্ত মজবুত হয় তথ্যের স্বাধীনতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ, সরকারি তথ্য ও নথিপত্র দেখার সুযোগ জন-সাধারণের থাকবে। এবং সীমিত কিন্তু ব্যতিক্রম ছাড়া এইসব তথ্য বা নথি যেন 'ব্যক্তিগত' বা 'গোপনীয়' বলে চিহ্নিত না হয়। (প্রশ্ন 37 দেখুন)।

সভা-সমিতির স্বাধীনতা

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ঠিকমত চালাতে গেলে মেনে নিতে হবে যে—সর্বজনীন ব্যাপারে লোকে খোলাখুলি মতামত দেবে, ট্রেড-ইউনিয়ন বা অন্যান্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করবে, প্রয়োজনে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং রাজনৈতিক

এটি বিধিসম্মত গণতান্ত্রিক অধিকার।

দল স্থাপন করবে ও তাতে অংশ নেবে। এই স্বাধীনতার মধ্যে আর যা পড়ে তা হল—অভিযোগের প্রতিকারে সম্মেলন ডাকা, বিক্ষোভ দেখানো বা আর্জি পেশ করার অধিকার।

58. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কিভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত?

গণতান্ত্রিক পিরামিডে (15 নম্বর প্রশ্ন দেখুন) কর্মস্থান, আবাসন, খাদ্য, জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনকে সমাজ জীবনের আবশ্যিক শর্ত বলে ধরা হয়। যে সমাজে বহু মানুষ নিরন্ন সেখানে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কখনই সম্পূর্ণ সফল হয় না। বেঁচে থাকার আবশ্যিক প্রয়োজনগুলি মিটলে তবেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকা সম্ভব। গণতন্ত্রের নীতিই হল প্রতিটি নাগরিকের মতপ্রকাশের সমান অধিকার ও সেই মতের সমান গুরুত্ব। যে সমাজে শিক্ষার সুযোগের মত অত্যাবশ্যক অধিকারে বৈষম্য রয়েছে সেখানে গণতন্ত্র কখনই পূর্ণ বিকশিত হতে পারে না। আবার একই সঙ্গে এই বৈষম্যগুলি সনাক্ত করে সেগুলি দূর করার উপায়ও হল গণতন্ত্র।

উন্নয়ন ও মানবাধিকার

উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। দীর্ঘকালীন স্থায়ী উন্নয়নের নীতি তখনই ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব যখন তা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। তা ছাড়া মানবাধিকার ও আইনের শাসনের সঙ্গে সাযুজ্য না থাকলেও উন্নয়ন প্রক্রিয়া সফল হবে না।

59. আইন মেনে অধিকার সীমিত করা কি গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে সঙ্গত?

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিচারে কিছু কিছু অধিকারের উপর বিশেষ কারণে সীমারেখা টানা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়। এই কারণ বা ক্ষেত্রগুলি হল—সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি। আবার কিছু অধিকারের ক্ষেত্রে এরকম সীমারেখা টানা যায় না যেমন চিন্তার স্বাধীনতা, নির্যাতন বা বৈষম্যমূলক ব্যবহারের হাত থেকে রেহাই। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি মানুষের এই অধিকারগুলি সুরক্ষিত থাকা উচিত। এই অধিকারগুলি রদ করা কখনই কাম্য নয়।

অধিকার সীমিত করার নৈতিক ভিত্তি

অধিকার কিভাবে কতখানি সীমিত করা যায় বা তাতে হস্তক্ষেপ করা যায়, আন্তর্জাতিক আইনে তা নির্দিষ্ট করে বলা আছে। অধিকারের সীমা নিয়ন্ত্রণ আইনমাফিক হতে হবে, তার বৈধ উদ্দেশ্য থাকতে হবে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সেই উদ্দেশ্য যেন সমর্থিত হয় এবং গণতান্ত্রিক সমাজের ধ্যানধারণার সঙ্গে এই উদ্দেশ্যের সঙ্গতি থাকতে

হবে। সরকার যেন একথা প্রমাণ করতে পারে যে অধিকার বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি।

বিশেষ পরিস্থিতি

কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘন বা হিংসায় লিপ্ত হওয়ার নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া দমন নীতি যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হলে তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে। এই রকম বিশেষ পরিস্থিতি তখনই হয় যখন কোন সংবাদপত্র এমন কিছু অত্যন্ত স্পর্শ কাতর খবর ছাপতে চায় যাতে ব্যক্তিবিশেষের জীবন অথবা দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে।

60. জরুরি অবস্থায় কি মানবাধিকার মুলতুবি রাখা চলে?

'রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার মত' কোন পরিস্থিতিতে যদি সরকারি ভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিছু নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডে এই ব্যবস্থা অনুমোদিত। বিভিন্ন সরকার জরুরী অবস্থা জারির সমর্থনে যে কারণগুলি সবথেকে বেশি দেখিয়ে থাকে তা হল দেশের ভিতরে রাজনৈতিক বা জাতিগত সংঘর্ষ ও তার জেরে হিংসা এবং সন্ত্রাস। এই অবস্থায় সাধারণত পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্বিচারে তল্লাশি ও গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কখনও বা বিচার ছাড়াই অনির্দিষ্ট কাল আটক করে রাখার ক্ষমতাও দেওয়া হয়।

যে অধিকার খর্ব করা যায় না

গণতান্ত্রিক সমাজে নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যাবে, তাও খুবই অল্প সময়ের জন্য এবং অপব্যবহারের বিরুদ্ধে যতদূর সম্ভব সবরকমের ব্যবস্থা নিয়ে। এ ছাড়াও কিছু কিছু অধিকার আছে যা জরুরী অবস্থাতেও বাতিল করা কিম্বা খর্ব করা যাবে না—যেমন জীবনের অধিকার, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি।

61. গণতন্ত্রে কি কোন ব্যক্তিকে বিধিসম্মত উপায়ে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা যায়?

তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে কে নাগরিক হবে বা নাগরিক অধিকার কিভাবে পাওয়া যাবে তা নির্ণয়ের ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের। কিন্তু এই সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। উদারহণস্বরূপ, বসবাসে ইচ্ছুক বিদেশিদের

পুলিশ ও সেনাবাহিনী সহ সরকারি পদাধিকাবীদেবও মানবাধিকাব শিক্ষা দেওয়া উচিত।

উপর যেন বহিরাগত বলে কোন বাধা নিষেধ আরোপ করা না হয। তেমনি, শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার সময় যেন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক চুক্তি মানা হয়।

বসবাসকারী বিদেশিদের অধিকার

কোন দেশে বসবাস করছে অথচ সেই দেশের নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অধিকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নাও দিতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রবণতা হল যে সব বিদেশি কোন দেশে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে বসবাস করছে তাদের রাজনীতিতে যোগ দিতে দেওয়া ও ভোটাধিকার দেওয়া (প্রশ্ন 21)। নাগরিকত্বের শর্ত রাজনৈতিক অধিকার বাদ দিলে অন্য সমস্ত মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা আইন সঙ্গত ভাবে বসবাসকারী বিদেশীদের দিতেই হবে। এ ব্যাপারে কোন বাছাবাছি চলবে না।[1]

62. গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের কোন অধিকার কি স্বীকৃত?

ধর্ম, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, জাতি অথবা ভাষাগত দিক থেকে সংখ্যালঘুদের জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এইসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র যে শুধু তাদের অস্তিত্বের নিরাপত্তা দেবে শুধু তাই নয়, এদের স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রাখা ও সেই পরিচয় সুদৃঢ় করাও রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার থাকা উচিত। দেশের কাছে তাঁরা যেন অন্যদের সঙ্গে সমান ভাবে অংশ নিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও নীতি নির্ধারণের সময়ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সংখ্যালঘুদের বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণা

জাতীয় কিম্বা ধর্মীয় এবং ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাপত্রে আর কিছু নীতির কথা বলা হয়েছে। 1992 সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় এই নীতিগুলি গৃহীতও হয়। সমস্ত রাষ্ট্রে না হলেও সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব দেখা যায় অনেক রাষ্ট্রেই। এই সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত করাই গণতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ কর্তব্য। এই মুহূর্তে সমস্ত দেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত নতুন আদর্শকে কাজে রূপান্তরিত করা।

63. মানবাধিকার বাস্তবে কি করে সুরক্ষিত রাখা যাবে?

গণতান্ত্রিক সমাজে মানবাধিকার সুরক্ষিত করার জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করা হয় তা সব সময় এক নাও হতে পারে। আন্তর্জাতিক আদর্শ অবশ্য এ বিষয়ে কিছু মান

---

1 ভারতে বসবাসকাবী বিদেশিদের ভোটদান ও অন্যান্য রাজনৈতিক কাজে যোগ দেওয়াব অধিকার নেই। কিন্তু তাঁদের অন্য সমস্ত মৌলিক অধিকাব ও স্বাধীনতা রয়েছে।—পৃ 99

স্থির করে দিয়েছে। এর মধ্যে আছে ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হলে সুবিচার পাওয়ার আশ্বাস। যে সব দেশের সরকার মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলতে স্বীকৃত সেইসব দেশের নাগরিকদের অধিকার আছে তা প্রয়োগ করার। রাষ্ট্রের সংবিধানে বিশেষ করে যে সব রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাশাপাশি মানবাধিকারকে ব্যাখ্যা এবং সুরক্ষিত করার নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার কাজে আবারও এগিয়ে এসেছেন ন্যায়ালয়গুলি। অধিকার সুরক্ষিত করতে এবং এ বিষয়ে আইনি সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ন্যায়ালয়ের দরজা খোলা। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ সরকার মেনে নিতে বাধ্য। সেই ধরণের কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে যদি সংবিধানে বলা থাকে তাহলে আইন প্রত্যাহৃত হতে পারে অথবা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই আবার অধিকার সুরক্ষিত করতে আইনি কিম্বা অন্য উপায়ে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যবস্থা নেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন কোন ধরণের পক্ষপাত না থাকে এবং সামাজিক কারণে দুর্বল, অক্ষম ও শিশুরা সব ধরণের প্রাথমিক নিরাপত্তা পায়।

যে সব প্রতিষ্ঠান অধিকার রক্ষা করে

গণতন্ত্রে মানুষ সুবিচার পাওয়ার এবং দাবি আদায়ের জন্য প্রথমেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শরণাপন্ন হয়। অধিকারের অ-প্রয়োগ বন্ধ করতে গণমাধ্যমগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে, অধিকার সুরক্ষিত করতে কার্যত একাধিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। ওমবুডসমান হল এমনই একটি উদাহরণ। এই স্বাধীন আধিকারিকরাই সরকারি প্রশাসনের কাজকর্মের উপর দৃষ্টি রাখতে পারেন। তবে গণতন্ত্রে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হল এর নীতি ও কার্যকারিতার প্রতি বিশ্বাস গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব এবং মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার কর্মসূচী কেবল স্কুল এবং কলেজের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখলেই চলবে না, বিস্তার ঘটাতে হবে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানেও। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

5

গণতান্ত্রিক বা নাগরিক সমাজ

64. নাগরিক সমাজ বলতে কি বোঝায়?

গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে নাগরিক সমাজের ধারণা জোরদার হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দুই ধরণের স্বৈরতন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে—ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিস্ট শাসন. এই দুই ক্ষেত্রেই সমাজ-সংস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলে নেয়। নাগরিক সমাজকে দুই ভাবে বিচার করা যায়। নঞর্থক ধারণা অনুসারে সমাজ-সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রের গতিবিধি সীমিত করা দরকার যাতে জীবনের সর্বস্তবে মানুষের সব উদ্যোগ বা প্রতিভা আত্মসাৎ করে রাষ্ট্র সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে। সদর্থক ধারণায়, স্বায়ত্ত-শাসিত সংগঠনগুলির মধ্যে দিয়ে মানুষে একজোট হয়ে নিজস্ব সমস্যার সমাধান করবে, জনমতকে পরিচালিত করবে, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং সামাজিক অধিকার অপহরণের বিরুদ্ধে সমাজকে রক্ষা করবে।

নাগরিক সমাজের উপাদান

নাগরিক সমাজের মূল উপাদানগুলি হল—বাজার অর্থনীতি (প্রশ্ন 9 দেখুন); স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম (প্রশ্ন 6 দেখুন); রাষ্ট্রের এক্তিয়ারের বাইরে সরকারি নীতিকে বিচার করার জন্য উপযুক্ত দক্ষতা এবং সর্বোপরি সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা যেগুলি একে অপরের পরিপূরক হয়ে মানুষকে নিজস্ব দায়িত্ব নিজে সামলাতে সাহায্য করে। গণতন্ত্রের সুরক্ষা ও প্রসারে এই সংস্থাগুলি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তা সে শ্রমিক বা পেশাদাব সংগঠন হোক, মহিলা, মানবাধিকার, উন্নয়ন-বিষয়ক, ধর্মীয় বা তৃণমূল সংগঠন, যাই হোক না কেন। মতপ্রকাশ ও স্বাধীন সংগঠন গড়ার মত মুক্ত পরিবেশে মানুষ যতই নিজের স্বার্থ রক্ষায় মিলেমিশে কাজ করে এগোতে চাইবে ততই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হবে এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন আপনাআপনি গড়ে উঠবে। সাধারণ মানুষের কাজে লাগলে তারাই এই সংগঠনগুলিকে উৎসাহ জোগাবে, যেমন সরকারি নীতি সম্পর্কে পেশাদার পরামর্শদাতার কাজ। মানুষের স্বীকৃতি পেলে এই সংগঠনগুলির কাজের উৎসাহ বাড়বে।

65. নাগরিক সভা বা সংগঠন কি অগণতান্ত্রিক হতে পারে?

নাগরিক সমাজে কর্মরত সংস্থা বা সংগঠনগুলি স্বাধীন। অর্থাৎ তারা নিজেরাই সংগঠিত হয় এবং নিজেদের তহবিল নিজেরাই গড়ে তোলে। তার মানে এমনও হতে পারে যে তাদের শক্তি বেড়ে গেলে তারা সরকারি নীতির বিশেষ বিশেষ দিক পরিবর্তন এমনকি তা বানচাল করার জন্যও জোর খাটাতে পারে। কখন তারা অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়তে পারে তা সবসময় বলা মুশকিল। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা সংঘবদ্ধ স্বার্থ-গোষ্ঠীর পরামর্শ নিচ্ছে এবং দরকার মত আপস-মীমাংসা করছে। তার কারণ, এটা ধরে নেওয়া হয় যে সরকার অনুমতি ও ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করবে। কিন্তু কিছু কিছু স্বার্থ-গোষ্ঠী সংগঠন, অর্থ ও যোগাযোগের জোরে অন্যদের তুলনায় সরকারকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পক্ষে একটা কথাই বিচার্য—সংস্থার সদস্যপদ উন্মুক্ত কি না। যদি তা না হয়ে দেখা যায় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ অর্থ ও ক্ষমতার জোরে কোন সংস্থা চালাচ্ছে তাহলে নিঃসন্দেহে তা অগণতান্ত্রিক। তাছাড়া, যে সংস্থার অভ্যন্তরীণ সংগঠন গণতান্ত্রিক, যেখানে নেতারা সভ্যদের ন্যায্য প্রতিনিধি সেইসব সংস্থাকে অনেক বেশি স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। শেষকথা এই যে, গণতান্ত্রিক সমাজে যে সব সংস্থা সামাজিক, আর্থিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধকের কারণে দুর্বল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের স্বীকৃতি সবার আগে পাওয়া উচিত। তা না হলে দুর্বল শ্রেণী কখনই রাজনীতিতে ঠাই পাবে না এবং তার শক্তিহীন হয়েই থাকবে।

66. আর্থিক সংস্থার সংগঠন কি গণতান্ত্রিক হওয়া উচিত?

অনেক গণতন্ত্রবাদী মনে করেন যে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে কর্মক্ষেত্রের অবদান অত্যন্ত জরুরী, আর তাই গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে কর্মক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলায় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। অন্ততপক্ষে শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন পরিচালনায় মালিকপক্ষ কোন বাধার সৃষ্টি করলে তার মোকাবিলার ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে সমবেতভাবে শ্রমিক তার জীবনযাত্রার মান, রোজগার বা কাজের পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে পারে ও উন্নতিসাধন করতে পারে। আরও উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য হবে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও মুনাফা ভাগ করে নেওয়া যাতে কর্মীরা দায়িত্ব ও প্রেরণার সঙ্গে সংস্থার সাফল্যে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়। তর্ক তোলা যেতে পারে যে এতে শ্রমিক ছাঁটাই করতে বা শৃঙ্খলা রক্ষা করতে মালিকদের অসুবিধা হবে। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতি সাক্ষ্য দেয়, যে সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের সৃজনীশক্তি কাজে লাগাতে উৎসাহ দেয় তারাই সফল। নিঃসন্দেহে, কর্মচারীদের 'প্রজা' মনে না করে 'নাগরিক' ভাবলে, ফলাফল ভাল হতে বাধ্য। গণতন্ত্র ও দক্ষতা পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব নয়। তবে একথা ঠিক যে কর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলে পরিচালক বর্গ

ও কর্মীদের মধ্যে মাইনে বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার তারতম্য ঘোচাবার জন্য চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

আর্থিক সংস্থার দায়বদ্ধতা

গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি আর্থিক সংস্থা স্থানীয় স্তরে বিশেষত পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ। যেমন রাষ্ট্র নাগরিক স্বার্থের বিপরীত কাজ করলে নাগরিক তার প্রতিকার চাইতে পারে, ঠিক তেমনি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নাগরিক সোচ্চার হতে পারে যদি তারা স্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবনের ক্ষতি সাধন করে। মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সংস্থাকে তাই পরিবেশ সুরক্ষিত রেখে আইনের আওতায় কাজ করতে হবে।

67. গণতন্ত্রে কি ব্যক্তি-সম্পত্তির প্রয়োজন আছে?

ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে অনেক কথা বলা যায়। বাজারী অর্থনীতিতে ব্যক্তি গত সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থনও রয়েছে কারণ রাষ্ট্রের আওতার বাইরে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বাড়াতে সাহায্য করে ব্যক্তি সম্পত্তি। তাই, নাগরিক সমাজে রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার্থে ব্যক্তি-সম্পত্তির ভূমিকা প্রধান।

ব্যক্তি-সম্পত্তির সীমা

তার মানে এই নয় যে সম্পত্তির অধিকারের উপর রাষ্ট্র যেভাবেই হস্তক্ষেপ করুক না কেন তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করতে হবে। বরং, ব্যক্তি-সম্পত্তি অনেকাংশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী, কারণ সম্পত্তির উপর কোন সীমা বেঁধে না দিলে তা অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে। ব্যক্তি সম্পত্তি কখন বা কিভাবে স্বাধীনতার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তা সমাজই ঠিক করবে। তার কারণ, সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সব জায়গায় এক নয়। সংক্ষেপে, সম্পত্তির ব্যবহার বৈধ, হবে যদি তা আইনের নিয়ন্ত্রনে থাকে এবং তার বন্টন ব্যবস্থা জন-নীতির আওতায় পড়ে। ব্যক্তি-সম্পত্তির সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের পক্ষে জরুরী হলেও, সেই অধিকার কখনও স্বাভাবিক বা অবাধ হতে পারে না। সম্পত্তির সীমা ও ভোগের শর্ত সমবেত ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

68. আর্থিক অসাম্য কি গণতন্ত্রে সঙ্গত?

সরাসরি হ্যাঁ বা না বলে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। ব্যাপারটা মাত্রাভেদে বিচার করা দরকার। সমাজে আর্থিক অসাম্য যত বাড়বে, রাজনৈতিক সাম্য গড়ে তোলা

ততই কঠিন হবে। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত অর্থের প্রভাবে রাজনৈতিক ফলাফল নির্দিষ্ট হতে থাকে। চূড়ান্ত ক্ষতি হয় তখনই যখন দরিদ্রের ভোট ধনীর স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। বিত্তবানেরা তখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে বা ধ্বংস করতে থাকে। অন্য দিকে, দরিদ্র মানুষ যদি দেখে যে গণতান্ত্রিক উপায়ে তার অবস্থার উন্নতির কোন আশা নেই, তাহলে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার কোন নৈতিক কারণ তারা খুঁজে পাবে না। এক্ষেত্রে প্রশ্নটা গণতন্ত্রের মান নিয়ে নয়, তার টিকে থাকার উপায় নিয়ে।

রাজনৈতিক অসাম্য হ্রাস করা

একথা মানতেই হবে যে বাজারী অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণ আর্থিক অসাম্য আসতে বাধ্য এবং তা অযৌক্তিক নয়। গণতন্ত্রবাদীরা চান, এই ধরনের অসাম্য দেখা দিলেও যেন রাজনীতির উপর তার প্রভাব কম। দাঁড়িপাল্লার একদিকে রাখা দরকার সংবিধানিক কড়াকড়ি—ভোটের সময় দল বা প্রার্থীর খরচের সীমা বেঁধে দেওয়া, খরচের হিসাব দাখিলের ব্যবস্থা ও গণমাধ্যমের উপর আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা নিয়ন্ত্রণ। নিক্তির অন্যদিকে সমস্ত নাগরিক যাতে জীবনযাত্রার ন্যূনতমমানের অধিকারী হয়ে নাগরিক হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই নিশ্চয়তা থাকা দরকার।

69. গণতন্ত্র কি আর্থিক উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল?

যথেষ্ট পরিমাণে নজির উপস্থিত করে প্রমাণ করা যায়, যে দেশ অর্থনীতিতে যত উন্নত সেখানে স্বৈরতন্ত্রের আশঙ্কা তত কম এবং গণতন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তার কারণ, আর্থিক উন্নয়নের ছাপ নাগরিকের চরিত্রে এবং নাগরিক সমাজের জীবনযাত্রার উপর পড়ে। সাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রসারের ফলে ভোটাররা ওয়াকিবহাল হয়। রকমারি প্রযুক্তি ও পেশাদারী কাজে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তারা সরকারের প্রভুত্বসূচক বা স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের বিরোধিতা করতে থাকে। তাছাড়া, আর্থিক উন্নয়নের ফলে নাগরিক সমাজে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, স্ব-সংগঠিত দল বা সমিতির সংখ্যা নানা ভাবে নানা আকারে বাড়তে থাকে, এবং সরকার যাতে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে সে ব্যাপারে তাদের দৃঢ়তাও বাড়তে থাকে।

ব্যতিক্রম

তার মানে এই নয় যে আর্থিক উন্নয়নের মান উঁচু হলেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব। সমস্ত মহাদেশেই একটি দুটি দেশ আছে যেখানে অবাধ নির্বাচনী প্রতিযোগিতা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতা বহুদিন ধরে রক্ষা করা গেছে অথচ সেখানকার

আর্থিক উন্নতির হার বেশ কম (যেমন, ভারত, জ্যামাইকা, বতসোয়ানা)। এই সব দেশের সরকারি নীতি হয়ত অর্থনৈতিক উন্নতির এক বিশেষ স্তরে পৌঁছনোর থেকে সার্বিক সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। তবে শিশু গণতন্ত্রের পক্ষে সবথেকে জরুরী হল অর্থনৈতিক উন্নতি। সেক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির সুফল সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাগাভাগি করে নিতে পারে এবং সম্পদ বণ্টন জনিত সংঘর্ষ কমিয়ে আনা যায়। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলি ও উন্নত দেশগুলির নীতি এই ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দুনিয়াকে সাহায্য যেমন করতে পারে; তেমনি আবার প্রতিবন্ধক হযেও দাঁড়াতে পারে।

70. ধর্ম গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক না প্রতিবন্ধক?

এটাও এমন এক প্রশ্ন যার জবাবে সরাসরি হ্যাঁ বা না বলে দেওয়া যায় না। এই প্রশ্নের জবাব বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিশ্বের প্রধান ধর্মমতগুলি বিচাব করে কোনটি গণতন্ত্রের সমর্থক, কোনটি নিরপেক্ষ বা কোনটির প্রভাব গণতন্ত্রকে পঙ্গু করে দিচ্ছে তা বলা অসম্ভব। প্রতিটি ধর্মমতেই পরস্পরবিরোধী ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিস্টধর্ম একদিকে যেমন সম্রাটের দৈব অধিকারের পক্ষে রায় দিযেছে অন্যদিকে তেমনই একইসঙ্গে সমর্থন করেছে প্রজাতন্ত্রের সমতার নীতিকেও। একই ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের একাংশ যখন স্বৈরতন্ত্রের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আরেক অংশ তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়েও স্বৈরতন্ত্রের বিরোধীদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। খ্রিস্ট ধর্ম এবং অন্য সব ধর্মেই এরকম নজির মেলে।

ধর্ম ও রাষ্ট্র

এরকম কথা বলা যেতেই পারে, যে ধর্মমত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের নীতিতে গঠিত এবং 'শিষ্যেরা' 'গুরুর' নির্দেশ চোখ বন্ধ করে মেনে নেয় তা গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল নয়। তুলনায় যে ধর্মমতে নিরন্তর বিতর্ক ও নতুন ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে তা বেশি গণতান্ত্রিক। তবে কোন ধর্মমতের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর কেমন তার থেকে গণতন্ত্রের পক্ষে অনেক বেশি জরুরি রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্কের বিষয়টি। রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, ভিন্ন মতাবলম্বীদের সম মর্যাদা না পাওয়ার আশঙ্কা তত বাড়বে। রাষ্ট্র ও ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক চরম অবস্থা হল ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ যখন রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক বিধান পালনের যন্ত্র বা উপায় হিসাবে দেখতে শুরু করে। এই অবস্থায় রাজনীতি ধর্মযুদ্ধের চেহারা নেয়, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়, তাদের উপরে চলে নির্যাতন ও মতপ্রকাশের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

ধর্মীয় কারণে দমন-পীড়ন ও তার জেরে গৃহযুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকেই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ধারণাটির জন্ম। আমরা যদি একথা বিশ্বাসও করি যে চরম এবং একমাত্র সত্য আমাদের ধর্মেই রয়েছে তা হলেও বহুধর্মমতবিশিষ্ট এই বিশ্বে ভিন্ন মতাবলম্বীর উপরে সেই বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে গেলে মানব সমাজকে বড় বেশি মূল্য দিতে হয়। সহিষ্ণুতার অর্থ নিজেদের বিশ্বাস ছেড়ে দেওয়া নয় বা অন্যদের আমার মতে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকা নয়। সহিষ্ণুতার অর্থ মানুষকে তার নিজের ভালমন্দ নিজেই বেছে নেওয়ার—তা যদি সে ভুল করে তাহলেও—মৌলিক মর্যাদাটুকু দেওয়া।

সংখ্যালঘু ধর্মমত

যে রাষ্ট্রে কোন ধর্মকেই বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় না সেখানেই সহনশীলতা এবং ধর্মমত ও বিশ্বাসের স্বাভাবিক বিভিন্নতার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে। সেই সব রাষ্ট্রে কব ব্যবস্থার মাধ্যমে বা ধর্মীয় শিক্ষায়তনগুলিকে অনুদান দিয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে সমতার ভিত্তিতে সাহায্য করা সম্ভব। যে রাষ্ট্রে কোন বিশেষ ধর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনস্বীকার্য, সেখানেও সহশীলতা রক্ষা করা সম্ভব যদি সরকারি ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব স্বীমিত করে ফেলা যায়, যেমন সরকারি অনুষ্ঠানে। কিন্তু, রাষ্ট্র যদি একবাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মানুশাসন অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর চাপায়, তাহলে সংখ্যালঘুদের বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা—তাদের মত প্রকাশ করার সভা-সমিতি গঠনের, বা প্রতিবাদ জানানোর অধিকার অপহৃত হবে। এমনকি, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যেও যারা ভিন্ন মত পোষণ করে, তাদেরও একই দশা হবে। লক্ষ্য করার বিষয় হল—কোন বিশেষ সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দাবি এবং সরকারের উপর গণ-নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক সমতার যে দীর্ঘকালীন প্রয়োজন, তা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হতে পারে।

71. ধর্মীয় বা জাতিগত সংঘাতের পটভূমিতে কি গণতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব?

এই কথা মানতেই হবে যে কোন নির্ধারিত ভূখণ্ডে স্বাধীন সংগঠন গড়ে তুলতে গেলে সেখানকার মানুষের মধ্যে এক এক ধরণের রাজনৈতিক ঐক্যচেতনা থাকা দরকার। সেই চেতনা বা পরিচয় গড়ে উঠতে পারে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সূত্রে—যে সূত্র ধর্ম, জাতি, ভাষা বা ঐ ধরণের সংকীর্ণতাব উর্দ্ধে সবাইকে বাঁধবে। আবার এই একাত্মতা বোধ রাজনৈতিক সংগঠনের দানও হতে পারে। এই ধরণের সংগঠন বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সমান মর্যাদা দেয় বলেই সকলের স্বাভাবিক স্বীকৃতি লাভ করে। সম্প্রদায়গত

বিরোধকে উস্কানি দেওয়ার সব থেকে বড় উপায় হল রাজনৈতিক পদ বা দফতরে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ। সম্প্রদায়গত কারণে রাজনৈতিক দফতরে প্রবেশাধিকার না পেলে কেউ নিজেকে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার বলে মনে করতেই পারেন। বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়ার এই অভিজ্ঞতা থেকে এক সম্প্রদায় সম্পর্কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরাগ ও আশঙ্কা জন্ম নেয়। সংকীর্ণদৃষ্টি রাজনৈতিক নেতারা তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য এই ধরনের আশঙ্কাকে কাজে লাগায়। এর পরিণতি স্বরূপ বহু ক্ষেত্রে দেশ ভাগ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তবে আলাদা হয়েও সমস্যা শেষ হয় না বরং অন্য মাত্রা পায়—জন্ম হয় নতুন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ঐতিহাসিক নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে নতুন নির্যাতনের পটভূমি তৈরি করা কোন সমাধান হতে পারে না।

সংবিধানিক রক্ষাকবচ

বর্তমান যুগে যেখানে বিভিন্ন ধর্ম বা জাতির মানুষের একত্রে বসবাস স্বাভাবিক সেখানে বৈষম্য ও নির্যাতনের হাত থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে প্রয়োজন সংবিধানিক রক্ষাকবচ (প্রশ্ন 10, 12, 50 ও 63)। এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে সংখ্যালঘুদেব জন্য এই সংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার আগে কোন নবগঠিত রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পায়।

72. গণতন্ত্রে পরিবারের প্রাসঙ্গিকতা কি ?

অতীতে এবং বর্তমানকালের অধিকাংশ সমাজেই শিশুপালন, পরিবারের দেখভাল ও পুরুষকে গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার দায়িত্ব মেয়েদের উপরেই বর্তেছে। এই বিশেষ পারিবারিক ব্যবস্থা আপাতভাবে একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে হলেও আসলে এই শ্রম বিভাজনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। গৃহের কাজে অনেক বেশি সময় দিতে হয় বলে মেয়েরা বাইরের কাজে প্রয়োজনীয় সময় বা শক্তি কোনটাই নিয়োগ করতে পারেন না। আবার বাইরের কাজে মেয়েরা সময় দিতে পারেন না বলেই গৃহকাজই তাঁদের উপযুক্ত সামাজিক ভূমিকা বলে চিহ্নিত হয়। এই সামাজিক ব্যবস্থা ও তাকে টিকিয়ে রাখার মনোভাব যতদিন না বদলাবে ততদিন মেয়েরা রাজনৈতিক সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্রও সফল হবে না। অবশ্য সরকারি নীতির সাহায্যে এবং বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে মেয়েদের নিজস্ব উদ্যোগে এই ব্যবস্থা পাল্টানো সম্ভব।

গণতন্ত্রে শিশু

ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তুলতে পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

রাজনীতির সঙ্গেই গার্হস্থ্য।

শিশুদের প্রতি পরিবারে বৈষম্যহীন আচরণ, পারিবারিক ব্যাপারে তাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া এবং অন্যের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে শেখানো, অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা প্রভৃতি শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য জরুরী। সমাজ সম্পর্কে শিশুর প্রাথমিক ধারণা পরিবারেই গড়ে ওঠে, রাজনীতি সম্পর্কে মতামতও তৈরি হয় বাড়ির বড়দের ধারণা ও বিশ্বাসের আদলেই এবং শৈশবে গড়ে ওঠা এইসব মতামত কোনও কোনও ক্ষেত্রে সারাজীবন বজায় থাকতে পারে।

73. গণতান্ত্রিক শিক্ষায় স্কুলের কি ভূমিকা?

সাক্ষরতা এবং পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা ছাড়াও স্কুলের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্বটি হল: নতুন প্রজন্মের হাতে সামাজিক কৃষ্টির উত্তরাধিকার তুলে দেওয়া। আবার ঐতিহ্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে শেখানো এবং বহু মত ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের যোগ্য জায়গাটি চিনে নিতে সাহায্য করাও স্কুলেরই কর্তব্য। এ ছাড়া গণতন্ত্র সম্পর্কে আরও নির্দিষ্ট শিক্ষা যেমন দেশের সংবিধান সম্পর্কে জানা, কিভাবে সংবিধান তৈরি হল তা বোঝা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা, মানবাধিকারের তাৎপর্য উপলব্ধি ইত্যাদি স্কুলেই সম্ভব। তবে গণতন্ত্রের শিক্ষা শুধু পুঁথিগত হলেই চলবে না। সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কে উৎসাহ দেওয়া, যুক্তি দিয়ে নিজের কথা বলতে ও অন্যের কথা শুনতে শেখানো, নির্বাচিত ছাত্রসংসদ ইত্যাদির সাহায্যে একসঙ্গে মিলেমিশে সিদ্ধান্ত নিতে শেখানো—গণতান্ত্রিক শিক্ষার জন্য জরুরী। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ঠিক কোন বয়সে এই শিক্ষাগুলি কিভাবে দেওয়া হবে তা নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে শিক্ষাপদ্ধতির উপর। তবে এই ধরনের শিক্ষায় 'রাজনীতির গন্ধ' রয়েছে বলে এর প্রয়োজনকে উপেক্ষা করলে গণতন্ত্রকে খুব বড় মূল্য দিতে হবে। সেই মূল্য গণতন্ত্রের গণভিত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়াও হতে পারে।

74. গণতান্ত্রিক কৃষ্টির উন্নতি কিভাবে সম্ভব?

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী চিন্তাবিদরা সব সময় বলে এসেছেন যে গণতান্ত্রিক কৃষ্টির উৎকার্ষ আসবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠাগুলির কাজের মধ্যে দিয়ে। যেমন, বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে তাদের আকৃষ্ট করবে, বিভিন্ন স্তরে রাজনীতিতে ভাগ নিতে সাহায্য করবে ও মানুষের দক্ষতা বা চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগাতে উৎসাহ দেবে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ-সুবিধা তাই যত বিস্তৃত হয় তত ভাল—তা সে প্রচলিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হোক বা নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সভা সমিতি বা সংগঠনের মধ্যে দিয়ে হোক।

বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দল বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সদস্যরা বহুলাংশে রাজনৈতিক শিক্ষা পেতে পারে।

গণতান্ত্রিক কৃষ্টির উন্নতিসাধন

স্কুলের শিক্ষা (প্রশ্ন 73 দেখুন) ছাড়াও অন্য অনেক উপায়ে গণতান্ত্রিক কৃষ্টির বিকাশ সম্ভব। শিল্পের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ধারণা ও অনুশীলন গড়ে তোলা যায়। ললিতকলা সমাজের দর্পণ—আজকের সমস্যা, অসন্তোষ বা প্রয়োজনকে গ্রন্থিবদ্ধ করে সমাজের সামনে তুলে ধরে। সর্বজনীন উৎসব উদযাপনে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে থেকে বিশেষ করে গণতান্ত্রিক ও জনপ্রিয় ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরা যায়। তাছাড়া প্রচার মাধ্যম তো আছেই—মানুষের কাছে বেশি করে খবর পৌঁছে দিয়ে ও সচেতন করে দিয়ে, সরকারি নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে, মাধ্যম হিসাবে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের সুযোগ ছাড়িয়ে গণমাধ্যম রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

6

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

75. আজ গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যাগুলি কি কি?

আজ গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যাগুলির মূলে অর্থনৈতিক সমস্যা। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে বেশির ভাগ মানুষ এই সমস্যার শিকার। উন্নত দেশগুলিতে যেভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেভাবে সরকারি বাজেটে কল্যাণমূলক কাজের জন্য বরাদ্দে তার প্রভাব পড়েছে, তা 1930-এর পরে প্রায় অভাবিত। সাবেক সমাজতন্ত্রী দেশগুলি ব্যক্তিপুঁজি ও বাজার অর্থনীতির ধাক্কায় পর্যুদস্ত—সেইসঙ্গে এসেছে অনিশ্চয়তা, প্রচণ্ড অসাম্য ও মুদ্রাস্ফীতির তাণ্ডব। উন্নয়নশীল বহু দেশে বছরের পর বছর উন্নয়নমান শূন্যের কোঠায় বা তারও নীচে পড়ে রয়েছে এবং তার ফলে জনসাধারণ দারিদ্রের চরম শিকার, কল্যাণমূলক কাজে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এবং দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়ছে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

এই যে এত মানুষ দেশে দেশে আর্থিক দুরবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে তার রাজনৈতিক ফল খারাপ হতে বাধ্য। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের সংঘাত বেড়ে চলেছে। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার জন্য লড়াই যত জোরদার হচ্ছে, ততই সে লড়াইয়ে হেরে সর্বস্বান্ত হওয়ার ভয়ও বাড়ছে। রোজগারের চেষ্টায় তাই অনেক মানুষকে দেশান্তরী হতে হচ্ছে। আর্থিক দুরবস্থার জন্য সমান নাগরিকত্বের আদর্শ সুদূরপরাহত থেকে যায়। শুধু তাই নয়, সামাজিক সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকে সন্ধিহান হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রথা যে দেশে মজবুত সেখানে হয়তো এই আঘাত সহ্য করা সম্ভব। কিন্তু যে সব দেশে গণতন্ত্র এখনও শৈশবে সেখানে দরকার অনুকূল পরিস্থিতি যাতে গণতন্ত্রের শিকড় শক্ত হতে পারে।

রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারানো

বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার তিনটি বৈশিষ্ট্য গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা

কমে যাওয়ার মুখ্য কারণ। যে সমস্ত সংস্থা আজকের দিনে কোনও দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে তার অধিকাংশ ওই তথাকথিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে অবস্থিত। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফল সব দেশকেই ভুগতে হচ্ছে, তবে সব থেকে বেশি অসুবিধায় পড়েছে কম উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলি। এই সমস্ত দেশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী—কাঁচা মালের দাম ঠিক করা, ঋণশোধের শর্ত তৈরি, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারের প্রায় কোন ভূমিকাই আজ আর থাকছে না। এই পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়েছে গত দুই দশকের গোঁড়া অর্থনৈতিক মতবাদের আধিপত্যের জেরে। এই মতবাদ অনুযায়ী নিজের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারের প্রায় কিছুই করার থাকে না। আর্থিক প্রগতি পুরোপুরি নির্ধারিত হয় বাজারের গতিপ্রকৃতি ও কোন ব্যক্তি বা সংস্থা সেই বাজারের সুযোগ কতখানি কাজে লাগাতে পারছে তার দ্বারা। বাজার অর্থনীতির প্রতি আস্থা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধির এক শক্তিশালী মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এর ফলে কার্যকর সরকার গড়ার বা দেশে-বিদেশে দরিদ্র ও হতভাগ্যদের হিতার্থে সংবেদনশীল মনোভাব গড়ে তোলার জন্য যে সামগ্রিক দায়িত্ববোধের প্রয়োজন তা হারিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর নির্ভর এবং সেগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস। আজকের দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র যেখানে পরাজিত ও যে কোনও ধরনের প্রগতিশীল আন্তর্জাতিকতাবাদ গুরুত্ব হারিয়েছে সেখানে এই ধরনের সম্মিলিত প্রয়াসের নতুন সংজ্ঞা প্রয়োজন।

76. গণতন্ত্র চালাবার সঙ্গতি কি দরিদ্র সমাজের আছে?

গণতন্ত্র চালাবার সঙ্গতি দরিদ্র সমাজের নেই—এই ধারণা গড়ে ওঠার কারণগুলি ভিন্নতর। তার একটি হল—গণতান্ত্রিক সংগঠন ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ এবং তাই রাষ্ট্রের সীমিত সময় সামর্থ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয় করে জনগণের আশু চাহিদা মেটানো উচিত। তা না করে, নির্বাচনী কর্মকাণ্ড, গণতান্ত্রিক প্রয়োজনে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, সংসদীয় দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ ও তা কার্যকর করতে সময় বরবাদ করা—এসব অপ্রয়োজনীয় বিলাস বলে মনে করা হয়।

গণতন্ত্রের অসুবিধা

অর্থনীতির সীমিত যুক্তির বাইরে এক বৃহত্তর সমস্যার উল্লেখ করে বলা যায় যে উন্নয়নশীল সমাজের অর্থনীতি ও সরকারের পক্ষে গণতন্ত্রের অসুবিধা সুবিধার থেকে অনেক বেশি। সদ্যগঠিত রাষ্ট্রে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রীয় চরিত্র প্রায়শ গড়ে ওঠে না এবং তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক ভেদাভেদের উপর স্থাপিত নির্বাচনী প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে ক্ষতিকারক হয়ে পড়ে। তাছাড়া, গণতন্ত্রকে অদূরদর্শিতা, সস্তা জনপ্রিয়তা ও অসহিষ্ণুতার

হাত থেকে বাঁচাতে যে ধরনের ওয়াকিবহাল ভোটদাতার প্রয়োজন তা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গেই আসা সম্ভব। তার মানে এই নয় যে জাতীয় একতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন গণতন্ত্রের থেকেও বেশি। ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্পর্ক মাথায় রেখে বলতে হয়, এগুলির প্রয়োজন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আগে, কারণ এগুলি গণতন্ত্রের ভিত্তি আবশ্যক শর্ত।

গণতন্ত্র এবং উন্নতি

এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি ও অসুবিধার উল্লেখ আগের কিছু প্রশ্নে করা হয়েছে। (প্রশ্ন 13, 36, 69 দেখুন)। সেগুলিকে এখন একসঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক। প্রথমত, শুধুমাত্র গণনাভিত্তিক পরিমাপে (যেমন, মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন) আর্থিক উন্নতি যাচাই করা যায় না। এটির একটি গুণগত দিকও আছে—যেমন, জন-কল্যাণের কথা মাথায় রেখে রোজগারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা এবং সরকারি অর্থ বিভিন্ন খাতে ঠিকমত বণ্টন (স্বাস্থ্য বা শিক্ষার সঙ্গে সেনাবাহিনীর বরাদ্দের তুলনামূলক বণ্টন)। ব্যাপারটা এই যে আর্থিক উন্নতির গুণগত দিকগুলো নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের রাজনৈতিক চরিত্র ও জনগণের কাছে তাদের দায়বদ্ধতার মাত্রার উপর আশা করা যায় গণতান্ত্রিক নির্বাচকমণ্ডলী ন্যায়নীতির দাবিতে সোচ্চার হয়ে চূড়ান্ত আর্থিক অসাম্য ঘুচিয়ে রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবে যাতে সামরিক খাতে বা সস্তা খ্যাতি অর্জনের জন্য ব্যয়বহুল পরিকল্পনায় পয়সা খরচ না করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা বুনিয়াদি খাতে খরচ করা হয়। তাছাড়া, উন্মুক্ত ও দায়বদ্ধ শাসনতন্ত্রে, ধনসম্পদ অনেক দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো যায়। মানবাধিকারের যথেচ্ছ লঙ্ঘন, পরিবেশের অবনতি বা দুর্ভিক্ষের মত বড় বড় কেলেঙ্কারি ঘটলে কোন উন্মুক্ত সরকার বছরের পর বছর সেগুলি ধামা চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। গণতন্ত্র, উন্নতি ও সুরক্ষিত মানবাধিকারের মধ্যে সার্থক সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 1993 সালের জুন মাসে মানবাধিকার নিয়ে আয়োজিত ভিয়েনার বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত চূড়ান্ত দলিলে।

গণতন্ত্রের উন্নতিসাধন

জনগণের কাছে যার কোন দায়বদ্ধতা নেই সেই সরকার কত নীচে নামতে পারে তা যখন দেখি তখনই প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি গণতন্ত্র ছাড়া সমাজের কোন গতি আছে? কাজেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বরবাদ না করে বরং দেশের পরিস্থিতি ও প্রয়োজন বুঝে কত ভালভাবে কাজে লাগানো যায় সেই চেষ্টাই করা উচিত।

77. উন্নত গণতন্ত্রগুলি উন্নয়নশীলদের জন্য কি করতে পারে?

উন্নয়নশীল দেশের সাহায্যে উন্নত গণতন্ত্র অনেক কিছু করতে পারে। সাধারণভাবে

বলতে গেলে উন্নতির অধিকারকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে উন্নয়নশীল দেশের প্রতি মানবজাতির দায়িত্ব পালন করতে পারে। তা ছাড়া, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে, প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত সরবরাহ করেও বিশেষ সাহায্য সম্ভব। সংবিধান বিশেষজ্ঞ, নির্বাচনী অফিসার ও সাংসদ থেকে শুরু করে সব ধরনের সরকারি পদাধিকারীকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগের সব থেকে ভাল ক্ষেত্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নির্বাচন বৈধ ও অবাধ হচ্ছে কি না তা যাচাই করার বহুল স্বীকৃত পদ্ধতি হল আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা টেনে মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ প্রচুর। সুষ্ঠু পরিচালনার দৃষ্টান্ত স্থাপন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্ভব যেমন সরকারের দায়বদ্ধতা। এই সবকটি ক্ষেত্রেই উন্নত দেশগুলিরও আরও অনেক কিছু করে দেখানোর আছে। নিজেদের ত্রুটি সংশোধন যত তাড়াতাড়ি করতে পারা যায় ততই তারা অন্য দেশের আরও বেশি সাহায্যে আসবে।

সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ

সহায়তার থেকেও বিতর্কের বিষয় হল গণতন্ত্রকে জোরদার করতে, বা বহু-দলীয় নির্বাচনী প্রথা ও ন্যূনতম মানবাধিকার কায়েম করতে, ঋণ-দান বা ঋণ প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে তথাকথিত রাজনৈতিক শর্ত আরোপের বিষয়টি। উন্নত দেশের এই নীতির সমর্থনকারীরা বলেন, বহুকাল ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অনেক স্বৈরাচারী শাসক সম্প্রদায়কে উন্নতিকল্পে ঋণ দিয়ে পুষ্ট করা হয়েছে। শর্ত আরোপ করলে স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী গোষ্ঠী যারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করে করে আসছে তারা উৎসাহ পাবে। এই যুক্তির যারা বিরোধিতা করেন তাঁদের বক্তব্য হল, কার্যক্ষেত্রে এই নীতি অসঙ্গত কারণ দেশের উন্নতি বিদেশ নীতির দ্বারা চালিত হয়। এই নীতির ফলাফলও অনিশ্চিত। কারণ তাতে উপর উপর মেনে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। সব চাইতে আপত্তিকর হল, দেশের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তে বিদেশের চাপানো বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটি। বহুলাংশে ব্যাপারটা নির্ভর করে বিশেষ পরিস্থিতি ও এই ধরনের নীতির রকমফেরের উপর। আজকের দুনিয়ায় একটা ব্যাপার ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে রাষ্ট্র যদি নাগরিক অধিকারের অপব্যবহার করে তাহলে 'সার্বভৌমত্বের' দাবি তুলে আন্তর্জাতিক চাপের হাত থেকে বাচতে পারবে না। (প্রশ্ন 55 দেখুন)। তবে এটা ঠিক, বিদেশি চাপের থেকেও বেশি কার্যকর আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের মানদণ্ড অনুযায়ী মানবাধিকার বলবৎ করা।

গণতন্ত্র ও 'কাঠামোগত বদবদল'

উন্নয়নশীল দেশগুলির উপরে উন্নত দেশের রাজনৈতিক শর্ত আরোপ সম্পর্কে দ্বিতীয়

আপত্তিটি ততটা নীতিগত নয়। এই মতটি হল: একদিকে গণতন্ত্রের সমর্থন ও অন্য দিকে ঋণশোধ এবং কাঠামোগত রদবদলের খাতিরে এমন অর্থনৈতিক নীতিগ্রহণ যা কিনা দুর্বল গণতন্ত্রকে আরও দুর্বল করে দিতে পারে—এই দুই আচরণ পরস্পরবিরোধী। বিদেশি ঋণের সুদ গুণতে যে আর্থিক চাপ সহ্য করতে হয় তা অর্থনৈতিক অনুদানের সুফলকে পুরোপুরি বরবাদ করে দিতে পারে। কাঠামোগত রদবদলের খাতিরে সরকারি ব্যয়বরাদ্দে যে ভাবে কাটছাঁট করতে হয় তাতে দরিদ্র জনগণের একমাত্র আশা—কল্যাণমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের সম্ভাবনা বিপন্ন হয়ে পড়ে। অথচ গণতন্ত্রের প্রতি ও সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি জনগণের আস্থা টিকিয়ে রাখতে কল্যাণমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ বিশেষ জরুরী।

78. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির গণতন্ত্রীকরণ কি সম্ভব?

হালের গণতন্ত্রগুলির প্রধান সমস্যা হল আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লোপ। এর প্রধান কারণ এই যে দেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বহুলাংশে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আগেই আলোচনা করা হয়েছে (প্রশ্ন 75 ও 77 দেখুন)। এই সমস্যাব পরিধি আরও বিস্তৃত যেমন পরিবেশের অবক্ষয়, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, জনসমষ্টির স্থানান্তর গমন, এবং শেষত সামরিকবাহিনীর হুমকি। সীমান্ত পারের ঘটনার প্রভাব থেকে কোন সমাজই আজ নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না।

দায়বদ্ধতার রকমফের

এখন জরুরী প্রশ্ন হল—প্রথমত, কি করে এমন সব আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ করা যায় যারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী বহুজাতিক বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। দ্বিতীয়ত, কিভাবে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার আওতায় আনা যায়। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এরকম অনেক সংস্থা এই মুহূর্তে কাজ করছে যেমন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ড বা আই এম এফ), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট) এবং খোদ রাষ্ট্রপুঞ্জ। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই সংস্থাগুলির কাজে অনেক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ ওই সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব ও দায়বদ্ধতার ভিত্তি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা। এই সংস্থাগুলি রাষ্ট্রনির্বিশেষে জনমতের কাছে যতটা না তার থেকে বেশি সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির কাছে দায়বদ্ধ। কোনও মতেই রফায় আসতে রাজি নয় এমন সদস্যরাষ্ট্রকে জোর করে ঠিক পথে আনার ক্ষমতা এই সংস্থাগুলির নেই। বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের গুরুত্ব আবার তাদের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সাবেক

মর্যাদা বা বর্তমান ক্ষমতার ভিত্তিতেই তার গুরুত্ব নির্ধারিত হয়।

বিশ্ব-সংসদ

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি গণতান্ত্রিক ধাঁচে সাজাতে সময় লাগবে। মানবাধিকার সম্মেলন বা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মতো প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র প্রসারের মাধ্যমেই তা সম্ভব। বিশ্ব সমস্যার আন্তর্জাতিক সমাধান খোঁজা আশু প্রয়োজন। তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশ্ব-সংসদ। বিশ্ব-সংসদের হাতে থাকবে কার্যকর ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে গড়ে উঠবে বিশ্ব নাগরিকত্বের ধারণা। বিশ্ব-সংসদের ধারণা আজ আর তাই কল্পনামাত্র নয়।

79. নতুন বিশ্ব-সমাজে কি জাতীয় পরিচয় আর থাকবে না?

আজ যে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া চলেছে তাতে এক পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব ধরা পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে স্থানীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ও অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য একসূত্রে বাঁধা পড়ছে। তাই এই আশঙ্কা থেকেই যায় যে সংস্কৃতি ও পরম্পরার ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হয়ত ভবিষ্যতে লোপ পাবে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সুস্থ ও উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ গড়ে তোলার প্রয়োজনে জাতীয় পরিচয় কিছু মাত্রায় বাঁচিয়ে রাখা দরকার। নাগরিকের রাজনৈতিক আনুগত্যে দাবি করার যে একচেটিয়া অধিকার জাতি-রাষ্ট্র আজ ভোগ করে ভবিষ্যতে তা হয়ত লোপ পাবে। এর বদলে আসবে মানুষের বহুমুখী রাজনৈতিক পরিচয় ও আনুগত্যের ধারণা। মানুষ তখন কোন অঞ্চলের, কোন রাষ্ট্রের অথবা কোন বহুরাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য বলে নিজের পরিচয় দেবে। অথবা তার পরিচয় হবে কোন উপমহাদেশীয় বা বিশ্ব-নাগরিক। গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের এই সম্ভাবনাকে স্বাগত জানানো উচিত। গণতন্ত্রে বিশ্বায়নের ঝোঁক মানুষকে জাতি-রাষ্ট্রের সীমিত পরিচয়ে ও একমুখী রাজনৈতিক আনুগত্যে বেঁধে রাখার পরিপন্থী।

80. গণতন্ত্রকে কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়?

গণতন্ত্রের উপরে প্রশ্নোত্তরের এই বই বিষয়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আলোচনা করে শেষ করাই সঙ্গত। সাধারণ মানুষ যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করার কোন কারণ খুঁজে না পান, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে গণতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা না থাকে, তা হলে তাঁরা সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করবেন না। ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করেও যদি অবস্থার কোন হেরফের না হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যদি মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছা বা সামর্থ না থাকে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগঠিত হওয়ার ও আন্দোলন করার মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার তাঁরা না পান, এবং সর্বোপরি

আশা হারিও না। গণতন্ত্র তোমাকে আবার সুযোগ দেবে যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হতে পার।

কর্মক্ষেত্রে ও পাড়ায় প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার কোন ক্ষমতাই জনগণের না থাকে তাহলে গণতন্ত্র অন্তঃসারহীন মোড়কের চেহারা নেয়। গণতন্ত্রীদের কাজ আজ তাই মোড়কের মধ্যে গণতন্ত্রের অন্তঃসার কি করে পুষ্ট হবে, গণ-নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক সমতার নীতি কিভাবে কার্যকর করা যাবে তা সন্ধান। সাবেক স্বৈরতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ করে অথবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি আরও শক্তিশালী হতে সহায়তা করে এই খোঁজ শুরু হতে পারে।

□

Lasertypeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi-110 055
and printed at Tarang Printers, Delhi-110 092